উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

উপন্যাস ও ছোটগল্পের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক পরিচিতি

ঐচ্ছিক পত্র – ১০৫

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় - ক

একক ১ - বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

একক ২ - উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

একক ৩ – উপন্যাসের উপাদান

একক ৪ – বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আঞ্চলিক ও সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা।

একক ৫ – বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা

একক ৬ – বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের আলোচনা

একক ৭ – বাংলা উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায় আলোচনা

পর্যায় – খ

একক ৮ – ছোটগল্পের উদ্ভব

একক ৯ – ছোটগল্প এবং অন্যান্য সাহিত্যরীতি

একক ১০ – বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথ

একক ১১ – বনফুলের ছোটগল্প – নির্মাণ ও ভাবনায় নূতনত্ব

একক ১২ – কল্লোলগোষ্ঠীর ছোটগল্প

একক ১৩ – বাংলা ছোটগল্পে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১৪ – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী ছোটগল্প

ঐচ্ছিক পত্র – ১০৫ উপন্যাস ও ছোটগল্পের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক পরিচিতি

পর্যায় - ক

একক ১ : বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, উপন্যাসের সূচনা ও নকশা আঙ্গিকের উপন্যাস, উপন্যাসে ইতিহাসচর্চা ও প্রথম সার্থক উপন্যাস ।

একক ২ : উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ – ঐতিহাসিক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, রোমান্সধর্মী উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস।

একক ৩ : উপন্যাসের উপাদান – প্লট, চরিত্র, পটভূমি, সংলাপ, প্রতীকের ব্যবহার, শৈলী ও ভাষা।

একক ৪ : বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি আঞ্চলিক ও সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা - আঞ্চলিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস।

একক ৫ : বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা – ঐতিহাসিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস।

একক ৬ : বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের আলোচনা – মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস।

একক ৭ : বাংলা উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায় আলোচনা – বঙ্কিমযুগ, বঙ্কিম পরর্বতী অপ্রধান ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের ধারায় বাঁকবদল- রবীন্দ্র উপন্যাস, উপন্যাসের ধারায় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১ - বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

বিন্যাস ক্রম

১.১ : উদ্দেশ্য

১.২ : ভূমিকা

১.৩ : উপন্যসের সূচনা ও নকশা আঙ্গিকের উপন্যাস

১.৪ : প্রশ্নোত্তর

১.৫ : উপন্যাসে ইতিহাসচর্চা ও প্রথম সার্থক উপন্যাস

১.৬ : প্রশ্নোত্তর

১.৭: আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১.৮: সহায়ক গ্রন্থ

১.১ : উদ্দেশ্য

শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের প্রকাশ আধুনিক কালে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ও শিল্পসভ্যতার অভিঘাত, মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত - জটিলতা , ইংরাজি উপন্যাসের সাথে পরিচয়, মূলত এসবই ছিল উপন্যাস সাহিত্য উদ্ভবের মূলে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে লিখেছেন – " রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ইংরেজের সহিত সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি

বিশ্বযুদ্ধ, ইংরেজ ঔপনিবেশিকতাবাদ -একদিকে সামাজিক পালাবদল অন্যদিকে চিন্তাভাবনায় আধুনিকতা, মধ্যবিত্তশ্রেনির আবির্ভাব, একদিকে গ্রামীণ সভ্যতার ভাঙ্গন, অন্যদিকে আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব, সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেনির দ্বন্দ্ব – সংঘাত,এসবই জন্ম দেয় সাহিত্যের এই নতুন শাখা উপন্যাসকে।

১.২ : ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সাহিত্যের একটি নতুন রূপকর্ম হিসাবে উপন্যাসের জন্ম হয়। য়ুরোপে গদ্য ভাষায় যথার্থ আখ্যান শুরু হয় বোকাচিও র লেখা 'Decameron' থেকে। তিনি এই গ্রন্থকে বলেছিলেন 'Novella Storie'। 'Novella' থেকেই পরবর্তীকালে 'Novel' শব্দের সৃষ্টি। 'নভেল ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ " The interpretation of human life by means of fictitious narrative in prose." ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস':আধুনিক যুগ – ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য।)

' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ড. দেবেশ কুমার আচার্য লিখেছেন – " আধুনিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দলিল হ'ল উপন্যাস। উপন্যাসের একদিকে যেমন থাকে জটিলতা তেমনই, অন্যদিকে থাকে সচেতন মনের আত্মপ্রকাশ । উপন্যাসে জীবনের যে সামগ্রিক রুপ উপস্থিত হয় সেই রূপ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কারণ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর ধ্যান- ধারণার সামগ্রিকতা তার শিল্প-সার্থকতার মূল উপাদানরুপে স্বীকৃত। আবার ব্যাক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও বিরোধ নিয়ত পরিবর্তনশীল । তাই প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ- সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে, তার রূপায়নও ঔপন্যাসিকের কর্তব্য । ব্যাক্তি -মানুষ সমাজ পরিবেশের আঘাতে যে যন্ত্রণা অনুভব করছে, যে যন্ত্রণা অস্তিত্বের – তাকে ফুটিয়ে তোলাও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ঔপন্যাসিককে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেশ ও কাল, তাঁর সময় ও সমাজ এবং ব্যাক্তিমানস সম্পর্কে সহস্র জটিল সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করতে হয়। সমালোচক হাডসন তাই বলেছেন- " Every novel must necessarily present a certain view of life and some of the problems

of life." এদিক থেকে উপন্যাস মানবজীবনের কাব্যও বটে,আবার ইতিহাসও বটে।" এই নভেলের সাথে উপাখ্যানের পার্থক্য রয়েছে। তাই সংস্কৃত উপাখ্যানের ন্যায় বাংলা উপন্যাস লেখা হয়নি। কারণ – "সব গল্প নভেল নয়,উপন্যাস নয়। 'নভেল' এর প্রকৃতি আলাদা। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে নভেল আমাদের দেশে এসেছে। বিশেষ করে,ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এক বিশেষ প্রকৃতির পাশ্চাত্য সাহিত্য,আমাদের সামনে ধরেছিল উপন্যাসের আদর্শ। (গোপাল হালদার, "বঙ্কিমের সৃষ্টিসম্পদ")। উপন্যাস বা নভেল হল- "fictitious prose narrative of sufficient length to fill one or more representative of real life in continuous plot" ('Concise Oxford Dictionary/ বাংলা সাহিত্য পরিচয় – ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।) তবে অনেক প্রাচীন সাহিত্যেই উপন্যাসের নানা লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য যেমন-

'রামায়ণ', 'মহাভারত'এ বাস্তব সমাজচিত্রের হালকা ছায়া, মানুষের সুখ দুঃখের বর্ণনায় রয়েছে উপন্যাসের আদি লক্ষণ, এই লক্ষণ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য যেমন – 'কথাসরিতসাগর', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরী' প্রভৃতির মধ্যেও উপন্যাসের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ দেখা যায়। যেমন – 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল' এ দেবী মাহাত্ম্য ছাড়াও মানুষের জীবন জটিলতা, বাস্তবতার প্রকাশ দেখা যায়, চৈতন্য বিষয়ক সাহিত্য, 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এসবেও উপন্যাসের কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উপন্যাসের যে সলতে পাকানো ছিল ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শ তাকে প্রজ্জ্বলনে সাহায্য করেছে।

১.৩ : উপন্যাসের সূচনা ও নকশা আঙ্গিকের উপন্যাস

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সংবাদ পত্রের আবির্ভাবে সমাজ জীবনের নানা খবরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সংবাদপত্র। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – "উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত

হইয়াছে। খবরের কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য দেশের মধ্যে যাহা কিছু বিচিত্র, কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সচেষ্ট থাকেন।... সংবাদপত্রের দর্পণে সমাজ নিজ বহিরবয়ব ও মনোবাসনার নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।" ১৮২৩ খ্রীঃ প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নববাবু-বিলাস'। নববাবুর পূর্বপুরুষের ধন অর্জন থেকে তার বিদ্যাশিক্ষার, তার ইংরেজি শিক্ষকের শিক্ষাদানপ্রনালী বিশদে বর্ননা করা হয়েছে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে বাবুর বিষয়কর্মে হাতেখড়ি, তার খলিপা কর্তৃক বাবুগিরির জীবনতত্ব ও সাধনমার্গে দীক্ষিত হওয়া, এরপর নববাবুর ফতুর জীবন ও তাহার স্ত্রী কর্তৃক বঞ্চনা, কারাবাস, দূরারোগ্যব্যধিতে নববাবুর জীবনের চরম পরিনতিলাভ।

বাবু একেবারেই ব্যক্তিত্বহীন, পরের বুদ্ধি দ্বারা চালিত, তার কোনও নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তার পিতা জীবিত থাকাকালীনই তার মধ্যে বদখেয়ালীর বীজ ঢুকে যায়। তার পরিবার ও তাকে সংশোধন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি। 'আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী লিখেছেন,- " শিক্ষাদিক্ষার অভাব এবং নীতিহীন পরিবেশে এই সব বাবুদের চারিত্রিক অধঃপতন কেমন ভাবে ঘটে 'তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের' উপাখ্যানে ভবানীচরণ তারই বিবরণ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন অংশের গ্রন্থনে শিথিলতা এবং অতিরিক্ত ব্যঙ্গপ্রবণতা সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল হিসাবে বইটির মূল্য অপরিসীম।"

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'নববিবি বিলাস'(১৮৩১) গ্রন্থে নববাবুদের বদ্ স্বভাবের ইন্ধন দেওয়ায় নববিবিদের বিদ্রুপ করা হয়েছে ।

'নববাবুবিলাস' এর ৩৫ বছর পর রচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এর নায়ক মতিলাল সাহেবের স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করেছিল কিন্ত কয়েকটা ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি হাবভাব ও চালচলনই শিখেছিল, বিদ্যা বেশিদূর হয়নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন – " 'আলালের ঘরের দুলাল' -এর নায়ক মতিলালের সহিত তুলনায় সে

একেবারে নিষ্প্রাণ, পারিবারিক-সংযোগসূত্র-বিচ্ছিন্ন ও ইচ্ছা-শক্তিহীন। তাহার ব্যাক্তিসত্ত্বা নেই...ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন মতিলালের সংশোধন হইয়াছিল,একতাল অক্ষম মাংসপিণ্ডরূপ নববাবুর অনুতাপও শিরাস্নায়ুগত দৈহিক আক্ষেপের উর্ধ্বে উঠে নাই।.... 'নববাবুবিলাস' এ তত্ত্বপ্রধান, মানুষ গৌণ; 'আলাল' এ মানবিকতা রক্ত মাংস – সহযোগে আর একটু সুপরিস্ফূট।" সেই সমাজে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাওয়া সন্তানদের বিগড়ে যাওয়া জীবন, পরিবারের কাউকে সম্মান না দেওয়া,এবং গ্রন্থটির শেষপর্যায়ে যখন মতিলালের কাছে আহারের অর্থটুকুও নেই সেই সময় সে উপলব্ধি করে তার ভুল, এবং সৎসংসর্গে শেষকালে তার চরিত্র ভালো হয়। সমাজে যে তখন ধন অথবা পদ বাড়লেই মান বাড়ত,বিদ্যা ও চরিত্রের জন্য কোন গৌরব হতো না সেই কথারও উল্লেখ আছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' এই প্রথম গদ্যময় বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু প্লট খাপছাড়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মানুষ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা র প্রকাশ দেখা যায় গ্রন্থটিতে।'

১৮৫৫ সালের 'মাসিক পত্রিকায়' 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। স্ত্রীলোকের চরিত্র,শিক্ষা,পরিবারের প্রতি কর্তব্য এই বিষয়গুলি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে উঠে এসেছে।'আলালের ঘরের দুলাল' এর পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত।দেশি শিক্ষার কুফল,মদ্যপান, লাম্পট্য ও অসামাজিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। মূল কাহিনি ও প্রধান চরিত্রের চেয়ে শাখাকাহিনি ও উপচরিত্র গুলি বেশি প্রগাঢ়। ঠকচাচার চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সার্থক উপন্যাস না হলেও সরস কৌতুক, বাস্তবধর্মী কাহিনি ও টাইপ চরিত্র সৃষ্টি র মাধ্যমে গ্রন্থটিকে উপন্যাসের পূর্বাভাস বলা চলে।ঠকচাচা' চরিত্রটি কূটবুদ্ধি, মিথ্যাচারে একেবারে বাস্তবতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন – " সমকালের জীবন সম্বন্ধে প্রবল স্পৃহা, এবং সেই জীবনের বহু ব্যত্যয়ে প্রবল বেদনায় 'আলালের ঘরের দুলাল' এর জন্ম।

কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা প্রথম গদ্যগ্রন্থ। বিভিন্ন অনুষ্ঠান – চড়ক,দুর্গা পুজা, রথযাত্রা প্রভৃতিকে তিনি ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ করেছেন।বাস্তব সমাজের ভণ্ডামির স্বাভাবিক বর্ণনা প্রশংসনীয়। তাঁর গ্রন্থে কল্পনার আশ্রয় নেই। হুতোমের নিজের কথায়-“হুতোমের নকশা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি, যদি ভালো করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়,তাহলে সাধারণে এর অর্থ বহন করতে পারতেন না ও উদ্দেশ্য বিফল হতো”(দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)।১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে১৯শ শতাব্দীর ৭ম দশক পর্যন্ত কোলকাতার সমাজজীবনের রেখাচিত্র অঙ্গন এই নকশা ধর্মী গ্রন্থের মূল প্রেরণা। ঠিক উপন্যাস নয় – কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত জীবনের চিত্র, তার ব্যঙ্গাত্মক বর্ননা, মূলত তিন ধরণের শ্রেনি চরিত্রের কথায় উঠে এসেছে। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত সাহেবি চালচলনকে অন্ধ অনুকরণকারী, শিক্ষিত নব্যপন্থী যারা অন্ধ অনুকরণকারী নয় এবং ইংরাজি জানে না এমন গোঁড়া হিন্দু। নকশা ধর্মী গ্রন্থটির মধ্যে কোনও ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চরিত্র গড়ে ওঠে নি। উপন্যাসের অন্যতম লক্ষন চরিত্র চিত্রনেরই অভাব দেখা যায় গ্রন্থটিতে। সমাজ জীবনের বাস্তবধর্মী নকশা জাতীয় রচনা যার থেকে সেকালের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রথার কথা জানা যায়।উনিশ শতকের কোলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটি থেকে । ‘ নববাবু-বিলাস' , ‘আলালের ঘরের দুলাল', ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তিনটে উপন্যাসই বাবু চরিত্র ও বাবু কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের আলোচনা।

শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স কতৃক রচিত ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ (১৮৫২) গ্রন্থটি খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিত বাঙালি পরিবারের জীবনযাত্রার কাহিনি।কয়েকটি পরিবারের সংসার জীবনের কিছু খণ্ডাংশ বর্ননা হয়েছে, খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এই রচনার উদ্দেশ্য। যদিও গ্রন্থটি ম্যুলেন্সের মৌলিক রচনা নয়। ড: সবিতা দাশ (চট্টোপাধ্যায়) এর গবেষণাসূত্রে জানা যায় ‘ The Calcutta Christian Observer' (১৮৫১) ও ‘The Oriental Baptist’ এ লিখিত আছে যে রচনাটি ‘ The last day of the week' নামক ইংরাজি আখ্যানের অনুকরণে রচিত। ফুলমনি ও করুনার গার্হস্থ্য জীবনের

বৈপরীত্যর দ্বারা তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার করেছেন। ফুলমনি মনে প্রানে খ্রিষ্টধর্মানুরাগী, তার গার্হস্থ্য জীবন সুশৃঙখল ও সুখের। তার স্বামী ও ছেলেমেয়েরাও ভালো চরিত্রের। তাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, অন্যদিকে করুণা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আস্থাহীন। তার সংসারজীবন দারিদ্র্যক্লিষ্ট, তার স্বামী মাতাল, দায়িত্বহীন, তার দুই ছেলের মধ্যে একজন চোর, কুপথগামী। অন্যজন সৎসংসর্গের প্রভাবে পাপের কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। করুণা অলস, কলহপরায়ণ, বাকী চরিত্রগুলিও নির্জীব। ‘বাংলা উপন্যাসে কালান্তর’ গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - “ ‘ফুলমণি ও করুণা’র বিরুদ্ধে অভিযোগ এই – সমগ্র বইটি খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচার মাত্র। কোনো অর্থে বইখানি নিম্নশ্রেনীর মানুষের জীবনালেখ্য নয়। বরঞ্চ খ্রীষ্টধর্মকে বরণ করলে যে ম্যাজিকের মত আর্থিক দুর্গতিকেও বশীভূত করা যায় বইটি তার ছবি।” তাই এই রচনাটিকে গদ্যকাহিনি বলা গেলেও উপন্যাস বলা যায় না। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যার ‘আলালের ঘরের দুলাল' কে উপন্যাস হিসেবে মানার যে লক্ষণ গুলির কথা বলেছেন সেগুলি হলো -

“ক. উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এই রচনায়।

খ. একটি বিস্তৃত দেশজ জীবনপটের, প্রকৃতির এবং মানুষের প্রথম ব্যবহার এখানে পাওয়া গেল।

গ. ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাহী মনের প্রথম পরিচয় এই রচনায় মিলল।

ঘ. সসর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টির সাক্ষাৎও প্রথম এই রচনায় লাভ করা গেল।”

উপন্যাসের প্রথম সূচনা ‘ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ গ্রন্থে হলেও তার যথার্থ পরিণতি সম্ভাবনাময় আরম্ভ দেখা যায় ‘আলালের ঘরের দুলাল' এ। আলোচিত গ্রন্থগুলোর কোনটিই সার্থক উপন্যাসের দাবী রাখে না।

১.৪ : প্রশ্নোত্তর

১. ‘নববাবুবিলাস' গ্রন্থটির লেখক ও রচনাকাল?

উ: ‘নববাবুবিলাস’ গ্রন্থটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা এবং রচনাকাল ১৮২৩।

২. নববাবুবিলাস এর কত বছর পর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রকাশ পায়?

উ: ৩৫ বছর পর।

৩. ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ কোন ইংরাজি আখ্যানের অনুকরণে রচিত?

উ: ‘The last day of the week ’.

৪. ‘ঠকচাচা’ চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

উ: ‘আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে।

৫. ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ র লেখক কে?

উ: কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১.৫ : উপন্যাসে ইতিহাসচর্চা ও প্রথম সার্থক উপন্যাস

উপন্যাসের সূচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়েছিল তাতে জীবন সম্বন্ধে কোন বৃহৎ, ব্যাপক সত্য ফুটে ওঠেনি। কিন্ত প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে এই অভাব পূর্ণ হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এর ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’(১৮৫৭) এর মধ্য দিয়ে। ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ এর মধ্যে ‘সফল স্বপ্ন' ও ‘ অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুটি আখ্যান রয়েছে। কন্টারের লেখা ‘ Romance of History – India’ নামক ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে ‘সফল স্বপ্ন' লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় আখ্যানটি মূল কৃতিত্বের অধিকারী। ‘সফল স্বপ্ন' আখ্যানটি অতি সংক্ষিপ্ত, শিশুপাঠ্য

রুপকথা ছাড়া শিল্পগুন তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এক দুঃস্থ পথিক জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করতে গিয়ে অনেক দুঃখের সম্মুখীন হয় এবং একটি হরিণ শিশুকে আহার্য হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে হরিণ শিশুটির জননীর কাতর দৃষ্টি দেখে হরিণ শিশুকে মুক্ত করে দেয়, তার এই করুনায় অভিভূত হয়ে ভাগ্যদেবতা তার স্বপ্নে আবির্ভূত হয় এবং জানায় ভবিষ্যৎ এ সে গজনী নগরের অধিপতি হবে, এরপর সে ঘোরাসানের অধিপতি আলেপ্তাগীনের দাসত্ব গ্রহন করে এবং আলেপ্তাগীন তার কন্যা জেহারীর সঙ্গে তার বিবাহ দেন। এবং তার মৃত্যুর পর তার জামাতা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।ইনি হলেন ইতিহাসের সুপরিচিত সুবক্তাগীন।তার স্বপ্ন সফল হবার কাহিনি বলা হয়েছে এই আখ্যানে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এ ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে কিছুটা কাল্পনিক ও কিছুটা ঐতিহাসিক গন্ডীতে আবদ্ধ রেখে ঘটনা প্রবাহ সাজানো হয়েছে। যেসব ঐতিহাসিক চরিত্র সাজানো হয়েছে সেগুলি হল- শিবজী, আরংজেব, শাহজাহান, রোসিনারা, জয়সিংহ, রামদাস স্বামী প্রমুখ। ঐতিহাসিক চরিত্র বর্নণার সাথে সাথে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি হল – আরংজেব এর দাক্ষিণাত্য আক্রমণ এবং শিবাজীর সাথে সংঘর্ষ, শিবজীর আত্মশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা, জয়সিংহের নিকট সাময়িক পরাভব, দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার প্রভৃতি,আবার যেসব কল্পনাপ্রসূত ঘটনা দেখানো হয়েছে সেগুলি হল – রোসিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবজী রোসিনারার প্রণয়, শিবজীর রোসিনারাকে বিবাহ প্রস্তাব এবং রোসিনারার প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কাল্পনিক ঘটনা।

গ্রন্থটি কেন যথার্থ উপন্যাস হয়ে ওঠেনি তার কারণ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ' বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন –

"তবে ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস অনভ্যস্ত রচনার আড়ষ্টতা লেখকের স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় হইয়াছে। বর্নণাপ্রথা ও মন্তব্য – যোজনা বহুস্থলেই গুরুভার গাম্ভীর্য ও নীরস তথ্য বহুলতার দ্বারা অভিভূত ও মন্থরগতি। বর্ণনায়ও সরসতার অভাব অনুভূত হয়।

কোন দৃশ্যই নাটকীয় তীব্রতা লাভ করিয়া পাঠকের মনে গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় নাই।কি বিবৃতি, কি বর্ণনায়, কি ঘটনা বিন্যাসে সর্বত্রই একটা স্তিমিত কল্পনা,একটা কুণ্ঠিত অনুভূতি,একটা তথ্যভার -জর্জর মানস মন্থরতার ছাপ পড়িয়াছে। ভূদেব এই নূতন সাহিত্যের সমিধ্ সংগ্রহ করিয়াছেন,যজ্ঞশালা নির্মাণ করিয়াছেন, দুই এক কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গও নিঃসারিত করিয়াছেন।কিন্তু তাহাঁর রচনায় প্রতিভার হোমানল – শিখা কোথায় ও পূর্ণতেজে দীপ্ত হইয়া উঠে নাই।"

১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ' দুর্গেশনন্দিনী' আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাংলার 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় বাংলা উপন্যাসের যাত্রারম্ভ।' এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে বলেছেন – " 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গ সমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল।... দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা আগে কখনও দেখি নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয় বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। "

'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির পটভূমি পাঠান ও মুঘলের দ্বন্দ্ব। মানসিংহ, জগৎসিংহ,কতলুখাঁ,খ্বাজা ইশা,উসমান - ঐতিহাসিক চরিত্র, আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা,বীরেন্দ্রসিংহ, মানসিংহ এই চরিত্রগুলি কাল্পনিক। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন – " 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের মতে ইতিহাসের ছায়াপটে অঙ্কিত রোমান্টিক আখ্যান। কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র এতে আছে বটে এবং পাঠান ও মুঘলের যুদ্ধ ঘটনাও ইতিহাসসম্মত।কিন্তু ইতিহাসই এ উপন্যাসের মূল বিষয় নয়। নরনারীর প্রেম – ভালোবাসা ও বিরহ- মিলন আত্মত্যাগ এই কাল্পনিক চরিত্র গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য।পাঠান যুগের বিবাদ, যুদ্ধ, সন্ধির শর্ত – এসব জানার জন্য পাঠক এ উপন্যাস পড়ে না, জগৎসিংহ – তিলোত্তমা -আয়েষার কথাই তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।এই তিনজনের কাল্পনিক কাহিনী বাদ দিলে উপন্যাসটি নিতান্তই কঙ্কালসার হয়ে পড়ে।তবে

যাকে ‘ইতিহাস রস' বলে (অর্থাৎ romance of history) তার ভূরি পরিমাণ দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসে আছে।”

উপন্যাসটিতে একাধিক উপকাহিনী আছে- বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলা, শশিশেখর ওরফে অভিরামস্বামী,মানসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষা – ওসমান। এবং ঐতিহাসিক পটভূমিও তথ্যসঙ্গত,শুধু প্রধান চরিত্রগুলি কল্পনাপ্রসূত। দুর্গেশনন্দিনী নামকরণ তিলোত্তমার নামে করা হলেও সে শুধু নায়িকা, তার নিজস্ব ভূমিকা নেই বললেই চলে, যদিও তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে মূল ঘটনা। বিমলা চরিত্রটি এক অনন্য সৃষ্টি, তাকেই প্রধান চরিত্র বলে ধরা যেতে পারে,, তার লম্পট পিতার কথা ও নিজের অশুচি জন্মবৃত্তান্তের কথা বলতে সে দ্বিধাবোধ করেনি।‘ ‘দুর্গেশনন্দিনী’ র প্রথম সংস্করণে ব্যাকরণগত কিছু ত্রুটি থাকলেও প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে ‘ দুর্গেশনন্দিনী' র গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন- “এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধার করি ‘ যখন ‘দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল,সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গ কবিগন বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতনযুগের আরম্ভ হইয়াছে- নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।”(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০১)

১.৬ : প্রশ্নোত্তর

১. ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস' কার লেখা?

উ: ভূদেব মুখোপাধ্যায় এর লেখা।

২. ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’এর মধ্যে কয়টি আখ্যান রয়েছে ও কি কি?

উ: দুটি, ‘সফলস্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’

৩. ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ এর প্রকাশকাল কত?

উ: ১৮৫৭

৪. ‘সফলস্বপ্ন' কোন কাহিনি অবলম্বনে রচিত?

উ: কন্টারের লেখা ‘Romance of History India নামক ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা।

৫. প্রথম সার্থক উপন্যাস কে কবে লিখেছেন?

উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর লেখা ‘ দুর্গেশনন্দিনী'(১৮৬৫) র প্রথম সার্থক উপন্যাস।

১.৭ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

১. ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’: ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য

৪. ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’: শিবনাথ শাস্ত্রী

৫. ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ২ - উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

বিন্যাস ক্রম

২.১ : ঐতিহাসিক উপন্যাস

২.২ : আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

২.৩ : রোমান্সধর্মী উপন্যাস

২.৪ : আঞ্চলিক উপন্যাস

২.৫ : কাব্যধর্মী উপন্যাস

২.৬ : চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস

২.৭ : পত্রোপন্যাস

২.৮ : মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস

২.৯ : রাজনৈতিক উপন্যাস

২.১০ : সামাজিক উপন্যাস

২.১১ : প্রশ্নোত্তর

২.১২ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

২.১৩ : সহায়ক গ্রন্থ

২.১ : ঐতিহাসিক উপন্যাস

উপন্যাস সৃষ্টির মূলে আছে কাহিনীবৃত্ত, চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ ও পটভূমি,রচনাশৈলী এবং ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন ।যে উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রকে আশ্রয় করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি বিশেষ যুগ ও ঘটনাকে সামনে রেখে জীবনকে দেখার চেষ্টা চলে সেই উপন্যাস ই হল ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস তথ্য সত্যকে প্রকাশ করে, আর সাহিত্য তথ্যকে নিষিক্ত করে কল্পনায়। অ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছেন- " Poetry tends to express the universal, history the particular (poetics)

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্যসত্যকে কল্পনার প্রানরসে নতুন মাত্রা দেওয়া হয় ।এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি বিশেষ অর্থবহ : " ইতিহাস পড়িব, না আইভানহো পড়িব, ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই-ই পড়ো।...কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।" কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ' সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ' গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করে বলেছেন-

১. সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু ও বাস্তব চরিত্রসমূহের পরিবর্তে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপন্যাসকার বেছে নেন অতীত ইতিহাসের কোনো বিশেষ একটি সময়পর্ব যার প্রতি প্রকাশ পায় লেখকের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রেমমুগ্ধতা।

২. উপন্যাসে বর্ণিতব্য যুগ তথা ঘটনা-কাহিনির প্রতি ঔপন্যাসিককে বিশ্বস্ত থাকতে হয়।সেই সময়কালের রীতিনীতি, আচার -ব্যবহার-সংস্কার, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে উপন্যস লেখককে সচেতন থাকতে হয়;অন্যথায় তাঁর উপন্যাসটি প্রকৃত ঐতিহাসিক বাস্তবতা অর্জনে ব্যর্থ হবে ' কালানৌচিত্য'(Anachronism) দোষের কারণে।

৩. ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক, নায়িকা তথা প্রধান কুশীলব সকলেই ইতিহাসের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।তাঁরা কেউ আপন কীর্তির বলে কীর্তিমান ;আবার কেউ অপকীর্তির দরুন অপযশপ্রাপ্ত,নিন্দিত। এইসব চরিত্রের রূপায়ণে ঔপন্যাসিককে ইতিহাসের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

৪.অবশ্য কালবিরোধগত দোষের আশঙ্কা সত্ত্বেও শিল্পগত প্রয়োজন বা মূল্যের তাগিদে ঔপন্যাসিক কিছু কিছু উদ্ভাবন ও পরিবর্তন করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত – " উপন্যাসে লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন।ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।"ইতিহাসের কাহিনির পাশাপাশি তাই স্থান পায় কাল্পনিক কাহিনি।

৫. ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেও তাদের যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলা ও উপন্যাসে জীবনভাবনা ব্যক্ত করার ক্ষমতাই ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত।

৬. ঐতিহাসিক উপন্যাসের কারবার ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে আবর্তিত জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে।ইতিহাসের সামাজিক -রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত,আবেগ আলোড়ন এই জাতীয় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের দেয় বিস্তৃতি, কখনওবা অতি-মানবিক উচ্চতা।

৭. ঐতিহাসিক উপন্যাসে থাকে মহাকাব্যিক বিস্তার; চরিত্রগুলি তাদের নিছক ব্যক্তি পরিচয়ের পোশাক খুলে ফেলে মহাকালের অঙ্গীভূত হয়ে যায় ; একটি বিশেষ স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে উপন্যাস পায় বিশ্বজনীন ব্যঞ্জনা।

৮. মহাকাব্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের হৃদ্যতার কারণেই তার ভাষাকে হতে হয় গম্ভীর ও ধ্রুপদী যাতে করে বিশেষ দেশকালের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়িয়ে কল্পনার আবিশ্ব স্পন্দিত বিস্তার মন্দ্রিত হয়ে ওঠে।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রোমান্সধর্মী রচনায়।তবে সেখানে কল্পনার অত্যাধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস ’ এর দুটি কাহিনি- সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়, এর মধ্যে দ্বিতীয়টি বেশি সফল।হিন্দু বীর শিবাজীর সাথে ঔরঙ্গজেব কন্যা রোশানারার প্রণয়কথা এর কাহিনি,তবে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এই রচনাকে গ্রহণ করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী' পটভূমি ঐতিহাসিক ছিল, এরপর ‘মৃনালিনী', ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরানী' ও ‘সীতারাম’ উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান দেখা যায় কিন্ত তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস হল – ‘রাজসিংহ'। রমেশচন্দ্র দত্তের ‘বঙ্গবিজেতা', ‘মাধবীকঙ্গণ', মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ও ‘রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আচার্য যদুনাথ সরকার ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন- “বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই,সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।”

‘রাজসিংহ’ উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির পাশাপাশি যেসব অনৈতিহাসিক চরিত্র দেখা যায় তা হল- যোধপুরী বেগম,মানিকলাল,মুবারক,দরিয়াবিবি, নির্মলকুমারী,প্রমুখ। ইতিহাসের মূল ঘটনাকে একই রেখেছেন কিন্ত যেখানে প্রয়োজন সেই কল্পনার ব্যবহার ঘটিয়েছেন।‘রাজসিংহ' ঔরঙ্গজেব এর ঐতিহাসিক যুদ্ধ ও মুবারক জেব উন্নিসার কাল্পনিক প্রেমকাহিনি কে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে।

২.২ : আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

ঔপন্যাসিক যখন নিজের জীবনের বিবৃতি অতীতের স্মৃতি উপন্যাসে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন তখন সেই উপন্যাসকে বলা হয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের চরিত্ররা নিজেদের কথা নিজেরা ব্যক্ত করে কিন্তু তার মধ্য দিয়েই উঠে আসে লেখকের ব্যক্তিজীবন। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখকের আত্মসর্বস্বতায় যাতে ডায়েরিধর্মী লেখা না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাঁর ব্যক্তিজীবন উঠে আসলেও তা যেন উপন্যাসের শিল্পরূপ ও শৈলী মেনে চলে।তবেই তা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে পরিগণিত হবে।

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 'গ্রন্থে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্য গুলি দিয়েছেন সেগুলি হল -

ক. গ্রন্থকারের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাসমূহ কিভাবে উপন্যাসটির বিষয় ও নির্মাণের তাৎপর্য ও বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে;

খ. নায়করূপী লেখকের গ্রন্থে বিধৃত কাহিনির গ্রন্থিমোচনে কোন্ কোন্ ঘটনা কীভাবে সহায়ক হয়েছে;

গ. স্মৃতিবাহিত ঘটনাবলি কীভাবে সংস্থাপিত ও প্রয়োজনে পরিমার্জিত হয়েছে উপন্যাসে;

ঘ. কীভাবে লেখক এর মান-অভিমান-আতুরতায় জড়ানো মনটি আড়াল হতে চাইলেও বারবার কম্পিত হচ্ছে আবেগে, স্মৃতিখন্ড গুলির অবিরাম দোলাচল ও টানাপোড়নে ;

ঙ. কীভাবে ও কতখানি নায়করূপী লেখক চরিত্রটি ক্রম বিকশিত হয়ে পরিণতির পূর্ণমাত্রা অর্জন করল

চ. মূল চরিত্র টি নিতান্তই এক মাত্রিক হয়ে উপন্যাস এর গঠন ও তার বিশ্বাসের স্থিতিমূল্যকে দুর্বল করে দিল কিনা ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন পরিলক্ষিত হয়, তিনি যেন শ্রীকান্তের মধ্যে নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতার কাহিনী ব্যক্ত করেছেন I

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শ্রীকান্ত উত্তম পুরুষে কাহিনীর বিবৃতি দিয়েছেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যখন প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৩২২ মাঘ সংখ্যায় তখন উপন্যাসটির নাম ছিল 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' লেখক এর নাম ছিল 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা' তারপর 'শ্রীকান্ত শর্মা' র পরিবর্তে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে প্রকাশিত হতে থাকে I

প্রথম পর্বে বাল্যজীবন ও কৈশোর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যৌবনে পদার্পণ, ইন্দ্রনাথের থেকে ভবঘুরে দুঃসাহসী জীবনের পরিচয় পেয়েছে, অন্নদা দিদির থেকে আদর্শ প্রেম সম্পর্কে জেনেছে রাজলক্ষ্মী হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তার মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয় বৃত্তান্ত উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে যদিও পরিণতি মিলনাত্মক হয় নি। তবুও বড় প্রেম নিজের বিশেষ ধর্ম থেকে পৌঁছে গেছে সর্বজনীন উপলব্ধি স্তরে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' এই জাতীয় উপন্যাস ।

২.৩ : রোমান্সধর্মী উপন্যাস

কল্পনা কে আশ্রয় করে প্রেম বীরত্বের উপাখ্যানই রোমান্স। রোমান্সে বাস্তবতার থেকে কল্পনারই আধিক্য দেখা যায়। মধ্যযুগের রোমান্সের থেকে আধুনিক রোমান্সধর্মী উপন্যাস এর পার্থক্য রয়েছে এ প্রসঙ্গে শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

"আধুনিক রোমান্স ও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে।... রোমান্স লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ কষ্ট করিতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাস এর সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধনে ইহাকে একেবারে নাগপাশ এর মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্স এর ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল সর্বগ্রাসী নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় " 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্ব চালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" বাস্তব, রোমান্স আর

ইতিহাসের সংমিশ্রণ দেখা গেছে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্স ধর্মী উপন্যাস।

২.৪ : আঞ্চলিক উপন্যাস

একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তার ভৌগলিক অবস্থান সেখানকার মানুষের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব, সেই অঞ্চলের ভাষা, তাদের জীবনযাত্রা - সুখ দুঃখ সেই অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের অপরিমিত বাস্তব অভিজ্ঞতা যখন আঞ্চলিক সত্তা বহন করেও চিরন্তন মানবিকতার স্পর্শে উন্নীত হয় তখন তা হয় আঞ্চলিক উপন্যাস।

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় বলেছেন –

"কোনো একটি অঞ্চল যখন এমন স্বতন্ত্র সত্তায় চিহ্নিত হয়ে যায় যে তার ব্যাপক প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা- ভাষা -আচরণ ভবিতব্য সবকিছু তখন সেই অঞ্চল, অঞ্চল সম্ভব মানব জীবনের ইতিবৃত্ত পরিচিতি পায় আঞ্চলিক উপন্যাসের অভিধায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্র ও লক্ষণগুলি চমৎকার ভাবে চিহ্নিত করেছেন –

"এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত, সুদূর ভৌগলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন অথবা কোন বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবী- গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন।... প্রতিবেশ সাধারণত সকল মানুষের মনের উপরই প্রভাবশীল, মানব জীবন লীলার স্বাধীন ছন্দও উহার নিগূঢ়, কখনও কখনও দুর্নিরীক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করিয়া থাকে। এই জাতীয় সাধারণ প্রতিবেশ- প্রভাব চিহ্নিত মানবজীবন কিন্ত আঞ্চলিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নহে।"

আঞ্চলিক উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল-

১. সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের পটভূমি;

২. চরিত্র ও কাহিনী বিন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রভাব;

৩. অঞ্চলভিত্তিক হলেও বিশ্বজনীনতা প্রকাশ পাবে;

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হল- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গণদেবতা’, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’।

২.৫ : কাব্যধর্মী উপন্যাস

যে উপন্যাসে আখ্যান ভাগ ও চরিত্রচিত্রণের তুলনায় ঔপন্যাসিকের কবিত্ব বেশি প্রাধান্য পায় সেই উপন্যাস কে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা নয় বরং গীতিকবিতার মাধুর্য এই উপন্যাসে দেখা যায়। নিঃসঙ্গ ব্যক্তি মনের অন্তরঙ্গ নির্জনতা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এই উপন্যাসের বিষয়। ঘটনা বর্ণনা বা চরিত্র-চিত্রন সর্বত্রই গূঢ় ইঙ্গিত ময়তা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’ এই জাতীয় উপন্যাসের সার্থক উদাহরণ। রবীন্দ্রোত্তর পর্বে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর অনেক উপন্যাস কাব্যগুণান্বিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘ আ সমুদ্র’, বুদ্ধদেব বসুর ‘যেদিন ফুটল কমল’, ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ‘বাসর ঘর’, ‘তিথিডোর’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২.৬ : চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে মনস্তত্ত্বের নানা দিকের উন্মোচন ‘ আধুনিক’ শিল্প সাহিত্য আন্দোলন মূলক পরিবেশে এক নতুন ধরনের উপন্যাসের সৃষ্টি হয় যা চেতনাপ্রবাহ রীতি উপন্যাস নামে পরিচিত। ‘সাহিত্যের রূপ রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’

গ্রন্থে কুন্তল চট্টোপাধ্যায় চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার মর্মার্থ এইরূপ -

১. এই জাতীয় উপন্যাসের মূলে থাকে অন্তর্জগৎ এর জটিল টানাপোড়ন। 'a novel that pays great attention to the complicated mental states of its character.'

২. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে সুসংবদ্ধ প্লট দেখা যায় না,চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখানোই প্রধান উদ্দেশ্য ,আকর্ষণীয় গল্প থাকাটা প্রয়োজনীয় নয়।

৩. মানবমনের অন্তর্জগৎে যে অজস্র চিন্তা লুকিয়ে থাকে,সেই সব চিন্তা বা অনুভবকে প্রকাশ করতে লেখক 'অন্তঃরস্থ স্বগতোক্তি' বা 'Interior monologue' ব্যবহার করেন। চিন্তাভাবনা গুলি যুক্তি পরম্পরার নিয়মানুযায়ী নয় বরং এলোমেলো ভাবে আসে।বাস্তবতার স্তরভেদ, শব্দ প্রয়োগ, বাক্যগঠনের ব্যাকরণরীতি এসব কিছু ঔউপন্যাসিক ভেঙ্গেচুরে পরিস্ফুট করেন।

৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তর্ভাষণ, সর্বদর্শীর বিবরণ এবং স্বগতোক্তির দ্বারা মানবমনের চেতনার প্রবাহটিকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

৫. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে এক কল্পনামন্ডিত,ছন্দোময় গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তার মধ্যে থাকে আপাত অসংলগ্নতা, অনেক সময় ছেদ বা যতি চিহ্ন ব্যবহার না করে একটানা চেতনাপ্রবাহকে ধরার চেষ্টা করেন লেখক ।

বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাসের ধারার শুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে।যদিও এগুলি যথার্থ চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস নয়। শৈলীর নিরিখে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'চোখের বালি' 'ঘরে বাইরে' কে চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রোত্তর লেখকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা', বুদ্ধদেব বসুর 'লাল মেঘ', গোপাল হালদারের 'একদা', মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের

রাত' উল্লেখযোগ্য। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' সার্থক চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস গুলির মধ্যে অন্যতম।

২.৭ : পত্রোপন্যাস

কোন উপন্যাসে যখন ঘটনা পরিবেশন হয় পত্রাকারে, চরিত্রাবলীর লিখিত পত্রের মাধ্যমে আখ্যানবস্তুর বিস্তার ঘটে তখন সেই উপন্যাস কে বলে পত্রোপন্যাস।

পত্রোপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কুন্তল চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন-

১. পত্রলেখক চরিত্রেরা তাদের নিজ নিজ চিঠির মাধ্যমে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, মানসিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া, এমনভাবে পাঠকসমীপে ব্যক্ত করার সুযোগ পায় যে সহৃদয় পাঠক সহজে চরিত্রের সঙ্গে নৈকট্য বোধ করেন।

২. উত্তম পুরুষ বিবরণদাতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে পত্রোপন্যাস লাভ করে এক বিপুল বিস্তার।

৩. লেখক এ-জাতীয় উপন্যাসে চরিত্রাবলীর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায় থাকতে পারেন।

৪. বিভিন্ন চরিত্রের পত্রের বিষয় ও ভঙ্গিতে যে বৈচিত্র্য থাকে তা উপন্যাসকে দেয় চমৎকার সজীবতা।

৫. একটি বিষয়ে একজনের বক্তব্য শোনার পর অন্য কেউ সে বিষয়ে কি ভাবছে সেই কৌতুহলকে উদ্গ্রীব করে রাখে।

৬. প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব ভঙ্গী ও ভাষায় আত্মকথনে মগ্ন থাকে বলে রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকে বেশি।

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বসন্ত কুমারের পত্র' বুদ্ধদেব গুহ র লেখা 'চান ঘরে গান', 'মহুয়ার চিঠি' প্রভৃতি এ ধরনের উপন্যাসের উদাহরণ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

‘পোনুর চিঠি’ হাস্যরসাত্মক কিশোর রচনা যাতে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা পত্রাকারে স্থান পেয়েছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘ক্রৌঞ্চমিথুন', তরুণ কুমার ভাদুড়ীর ‘সন্ধ্যাদীপের শিখা’ য় পত্রোপন্যাস এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

২.৮ : মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

যে উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান ভাগের র তুলনায় মনস্তত্ত্ব বেশি প্রাধান্য পায়, যে উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব বর্জন করলে উপন্যাসটি অবলম্বনহীন হয়ে পড়বে সে উপন্যাসই হল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। চরিত্রের অন্তর মানষিক দ্বন্দ্ব উপন্যাস কে এগিয়ে নিয়ে যায় এ ধরনের উপন্যাসে।বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন – ‘ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন’। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোমান্সধর্মী উপন্যাস কপালকুণ্ডলা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এর নজির মেলে তবে সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’, ‘ঘরে-বাইরে’, এছাড়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘গৃহদাহ’ এ ধরনের উপন্যাস এর উদাহরণ।

২.৯ : রাজনৈতিক উপন্যাস

উপন্যাস সাহিত্যে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা অসম্ভব কিন্তু যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা কাহিনি কে কেন্দ্র করে, দেশ-কাল- স্থান- পাত্র আর্থসামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্ব, সমস্যা পরিস্ফুট হয় তাকে বলে রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনৈতিক উপন্যাসে যদি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে তাহলে তা যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাসের পথে অন্তরায়। রাজনৈতিক উপন্যাসেও থাকতে হবে সর্বজনীন আবেদন। রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

“সমসাময়িক জগতের উদ্ ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা

স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতি ও সুকুমার আদর্শবাদ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। সেজন্য স্বাধীনতা- সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর, ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা, কংগ্রেস ও কমিউনিজম্ মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, স্বাধীনতা- লাভের পর বৈষম্যবর্জিত নতুন সমাজ গড়ার একাগ্র প্রচেষ্টা, দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা নিয়ে আধুনিকযুগের বহু উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এই দেশব্যাপী উত্তেজনার মোহ যেন সাহিত্যিককে পেয়ে বসেছে ও তার শাশ্বত মূল্যবোধকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছে। এবিষয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটি অনায়াস-লভ্য, যোগসুত্র বর্তমান, এমন একটি সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশোন্মুখ , লিখতে বসলেই এমন একটি নিবিড় আবেশ ঘনিয়ে আসে যে এই প্রলোভন সংবরণ অমানুষিক আত্মসংযমের ব্যাপার। দেখতে দেখতে নদীতে জোয়ার আসার ন্যায়, ভাবের ও ভাষার দুর্দম উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের কলেবর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।... রাজনৈতিক উষ্ণপ্রস্রবণে অবগাহন দেহে মনে এমন আরাম ও তৃপ্তি আনে যে ,এতে গা ভাসালেই স্রোতোবেগে চরম সিদ্ধির উপকূলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।"

রাজনৈতিক উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য -

১. সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ,

২.সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের সংকট;

৩.পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে সমালোচক শিশির দাস ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস বলে আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা',শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', গোপাল হালদারের 'একদা' সমরেশ বসুর 'বি টি রোডের ধারে' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' ইত্যাদি রাজনৈতিক উপন্যাস এর উদাহরণ।

২.১০ : সামাজিক উপন্যাস

সমাজ জীবন ব্যতিরেকে কোন উপন্যাসই রচিত হতে পারে না তাই সমস্ত উপন্যাসেই সমাজ জীবনের কথা উঠে আসে তবে মূলত যে উপন্যাসে বাস্তব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ঘটনার বিবরণ- বিশ্লেষণ, সামাজিক দ্বন্দ্ব- সংঘাত, সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য পায় তাই হলো সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাস বিশ্লেষণ করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- " সমাজ চিত্র প্রধান সামাজিক উপন্যাসের দুটি গুণগত শ্রেণি কল্পনা করা চলে, প্রথমটিতে ঔপন্যাসিক প্রচলিত সমাজপটের প্রতিষ্ঠা ভিত্তিকে আঘাত হানেন, যেমন – থ্যাকারে। দ্বিতীয়টিতে সমাজের পূর্বস্থির মূল্য গুলির ক্ষেত্রে নতুন প্রশ্নের উদ্ভবকে লেখক যাচাই করেন- যেমন জর্জ ইলিয়ট। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহৃত কালখণ্ডের উপর বৈশিষ্ট্যের ভিতর থেকে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বরূপকে নিষ্কাশিত করে নেয়া হয়। সুতরাং লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশিষ্টতায় রসেরও বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়। সামাজিক উপন্যাসে লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতায় তার চরিত্র গুলির ব্যক্তিস্বরূপের রুপায়ন রসগত বিশিষ্টতা লাভ করে।" (সামাজিক উপন্যাস : অলোক রায় সম্পাদিত সাহিত্য কোষ: কথাসাহিত্য)

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান' প্রভৃতি।

২.১১ : প্রশ্নোত্তর

১.' শ্রীকান্ত' কোন ধরনের উপন্যাস?

উ: আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

২. একটি কাব্যধর্মী উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: 'শেষের কবিতা'

৩. 'তিথিডোর' উপন্যাসটি কার লেখা?

উ: বুদ্ধদেব বসুর।

৪. দুটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পদ্মানদীর মাঝি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাকের উপকথা'।

৫. কে 'আনন্দমঠ'কে 'ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস' বলেছেন?

উ: সমালোচক শিশির দাস।

২.১২ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. বাংলা উপন্যাসের শ্রেনিবিভাগ করে যে কোনো দুটি শ্রেনির উপন্যাস আলোচনা কর।

২.১৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১. 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' – কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

একক ৩ - উপন্যাসের উপাদান

বিন্যাস ক্রম

৩.১ : ভূমিকা

৩.২ : প্লট

৩.৩ : চরিত্র

৩.৪ : পটভূমি

৩.৫ : সংলাপ

৩.৬ : প্রতীকের ব্যবহার

৩.৭ : শৈলী ও ভাষা

৩.৮ : প্রশ্নোত্তর

৩.৯ : আত্মমূল্যায়্যণধর্মী প্রশ্ন

৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.১ : ভূমিকা

যে কোন সৃষ্টির মূলেই থাকে বেশ কিছু উপাদান, উপন্যাস সৃষ্টির মূলেও এমন কিছু উপাদান বা উপকরণ আছে। উপন্যাস এর প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি হল - ১.

আখ্যানভাগ, ২. চরিত্র, ৩.পটভূমি, ৪. সংলাপ, ৫.শৈলী। এছাড়াও প্রতীকের ব্যবহার ,ভাষা, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন এসব নির্ভর করে ।

৩.২ : আখ্যানভাগ বা প্লট

উপন্যাসের মূল আকর্ষণ কাহিনি। সেই কাহিনির সুসংবদ্ধ বিন্যাসকে বলে আখ্যানভাগ বা প্লট। জোসেফ টি শিপলে সম্পাদিত গ্রন্থে যা ব্যাখ্যাত হয়েছে তা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য –"Plot is that framework of incidents,however simple or complex ,upon which the narrative or drama is constructed;the events of the depicted struggle,as organized into an artistic unit.In the poetics Aristotle names plot as the first essential of drama or epic.The elements of plot are a beginning that presumes further action,a middle that presumes both previous and succeeding action and an end that requires the preceding events but no succeeding action.[Dictionary of word Literary Terms.] ই এম ফস্টার তাঁর 'Aspects of Novel'গ্রন্থে প্লট ও স্টোরির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, ফস্টার বুঝিয়েছেন 'The king died,and then the queen died' অর্থাৎ রাজা মারা গেলেন তারপর রানী মারা গেলেন এটা হল গল্প কিন্ত 'The king died and then the queen died in grief' অর্থাৎ রাজা মারা গেলেন তারপর সেই দুঃখে রানীর মৃত্যু হল এটা হল প্লট। কারণ এখানে কার্যকারণ বোধ প্রাধান্য পেয়েছে, তবে কেবলমাত্র কাল পারম্পর্য বজায় রাখাই নয়- অনিবার্যতার নিয়মে চূড়ান্ত পরিণতির লক্ষ্যে পৌঁছালেই উপন্যাসে প্লটের শর্তরক্ষা হবে।

অনিবার্যতার নিরিখে প্লটকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় –

ক. শিথিল প্লট

খ. দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট

কাহিনির ঐক্যের নিরিখে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় –

ক. সরল

খ. জটিল

উপস্থাপন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে দু ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. প্যানারমিক

খ. সিনিক

গঠনগত দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বৃত্তাকার

খ. পন্থাকার

গ. হর্ম্যাকার

অনিবার্যতার নিরিখে প্লটের শ্রেনীবিভাগ

শিথিল প্লট -

বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে যখন কাহিনি গড়ে ওঠে এবং তাতে কার্যকারণের শৃঙ্খলা অনুপস্থিত থাকে তা হল শিথিল প্লট। ঘটনাসমূহ কেন্দ্রীয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ড্যানিয়েল ডেফো-র অভিযান কাহিনি ‘রবিনসন ক্রুশো', চার্লস ডিকেন্সের ‘ ডেভিড কপারফিল্ড’ এর উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে এর উদাহরণ ‘পথের পাঁচালী’।

দৃঢ়বদ্ধ প্লট –

এই ধরনের প্লটে প্রতিটি ঘটনা স্বাভাবিক কার্যকারণ সূত্রের পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’ এর উদাহরণ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে

শিথিল প্লটেও কিছুটা ঐক্যসূত্র থাকে আবার দৃঢ়পিনদ্ধ প্লটেও এমন কোন ঘটনা বা চরিত্র দেখা যায় যা মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয়। আবার এই দুই ধরনের প্লট এর মধ্যবর্তী অনেক উপন্যাস আছে যা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কাহিনির ঐক্যের নিরিখে প্লটের শ্রেণিবিভাগ

সরল প্লট -

সরল প্লটে একটি মাত্র কাহিনির উপস্থাপন ঘটে, উদাহরণ - বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।

জটিল বা যৌগিক প্লট –

প্রধান কাহিনির পাশাপাশি অনেক উপকাহিনি থাকে যা মূল কাহিনিকে তাৎপর্যবহ করে তোলে। উদাহরণ – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ'।

উপস্থাপন পদ্ধতির নিরিখে প্লটের শ্রেনীবিভাগ

প্যানোর‍্যামিক প্লট –

এই ধরনের প্লটে চরিত্র ঘটনার মধ্যে আংশিক কার্যকারণ সূত্র থাকে, কাহিনি পরিণতিতে স্পষ্ট সমাধান হয় না, অনেক চরিত্র থাকে যা মূলত 'টাইপ- ধর্মী', এর প্লট মহাকাব্যধর্মী বৃহদায়তন এর হয়ে থাকে। যেমন থ্যাকার এর 'ভ্যানিটি ফেয়ার'।

সিনিক প্লট -

এই ধরনের প্লটে একটি ঐক্যসূত্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতিক্রম করে পরিণতিতে পৌঁছায়। যেমন – টমাস হার্ডি 'র ' দ্য রিটার্ন অব দ্য নেটিভ।

গঠনগত দিক থেকে প্লটের শ্রেণীবিভাগ

বৃত্তাকার প্লট -

বৃত্তাকার প্লট দৃঢ়সংবদ্ধ, আদি-মধ্য- অন্ত্য সংবলিত একটি কাহিনি যা অনিবার্য ও সুস্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছায়। উদাহরণ- ' কপালকুণ্ডলা'।

পন্থাকার -

এর প্লট শিথিল, টুকরো ঘটনা কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে সরলভাবে গতিময় হয়। প্লটের নির্মাণ থাকে পান্থজনের জীবনের অভিজ্ঞতা, উদাহরণ- 'পথের পাঁচালী'।

হর্ম্যাকার প্লট -

জটিল গঠনরূপ, ঘটনা ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্য থাকে এবং বহু চরিত্র এবং মূল কাহিনির পাশাপাশি উপকাহিনির সংযোগে গড়ে ওঠে, বিন্যাস একই সঙ্গে সুসংবদ্ধ ও শিথিল। উদাহরণ – 'রাজসিংহ'।

৩.৩ : চরিত্র

যাদেরকে নিয়ে কাহিনি গড়ে ওঠে তাদেরকে ওই কাহিনির চরিত্র বলা হয়। চরিত্র শুধুমাত্র ব্যক্তির বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য নয় তার অন্তর্জগৎ, চিন্তাধারা- ভাবনা কেও বোঝায়।প্লট ও চরিত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উপন্যাসের চরিত্র কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

ক. নির্বিশেষ বা টাইপ (Type)

খ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র (Individual)

যে চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজস্ব ব্যক্তি পরিচিতি অপেক্ষা কোন গোষ্ঠী বা কোন মতবাদ কে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় তাই হলো টাইপ ধর্মী চরিত্র।

যে ধরনের চরিত্র তার নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, বহুচরিত্রের সমাবেশেও চরিত্রটি নিজ বৈশিষ্ট্য গুনে পাঠক মনে দাগ কাটে সে ধরনের চরিত্রকে বলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র। ই. এম. ফস্টার চরিত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. স্থির চরিত্র বা Flat character

খ. পরিবর্তনশীল চরিত্র বা Round character

স্থির চরিত্র একমাত্রিক। এই ধরনের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের 'হরলাল', 'শেষ প্রশ্নে'র 'কমল', অপরদিকে যে ধরনের চরিত্র পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বহু মাত্রা পায় সেই চরিত্র রাউন্ড ক্যারেক্টার বা বর্তুলাকার চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' র নাম চরিত্র এর উদাহরণ।

দৃঢ়সংবদ্ধ প্লটে গঠন বৃত্তাকার বলেই সেখানে চরিত্রের বিকাশ 'পূর্বপরিকল্পিত' কিন্তু শিথিল সংবদ্ধ গঠন উপন্যাসে চরিত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচকের অভিমত 'ঔপন্যাসিক যেভাবে তাঁর জগতকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সেইভাবে ভাবিত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয় যে কোন চরিত্র উপন্যাসের তাগিদকে অস্বীকার করে ঘটনার ক্রম কে লংঘন করে স্বাধিকারের আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এইটি বোধ হয় তার শৈল্পিক সার্থকতার নিরিখ। মোটকথা এই নিরিখের তুলাদন্ডে ও চরিত্রের সামগ্রিক পূর্নতার উপরেই নির্ভর করে তার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতা ও সার্থকতা'। [শিশির চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাসের স্বরূপ I]

৩.৪ : পটভূমি

উপন্যাসে যেখানে ঘটনাগুলি ঘটে চরিত্ররা যেখানে বিচরণ করে সেটিই উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের পটভূমি ছোট বা বড়ো হতে পারে, মহাকাব্যের মত উপন্যাসের পটভূমি প্রসারিত হবে। আবার আধুনিক উপন্যাসের পটভূমি এতটা প্রসারিত হয় না। M.H Abrams পটভূমি' প্রসঙ্গে বলেছেন-

"The setting of a narrative or dramatic work is the general locale and the historical time in which its action occurs,the setting of an episode or scene within a work is the particular physical location in which it takes place ."

বাস্তব বর্ণনার পাশপাশি কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাশৈলীর সাহায্যে লেখক নির্মাণ করেন পটভূমি। সমালোচকরা মনে করেন 'চরিত্র এবং ঘটনাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে নিজে অন্তর্হিত হয়ে হয়ে যাবার মধ্যে পটভূমির সার্থকতা ।

উপস্থাপন কৌশল এর উপর ভিত্তি করে পটভূমির প্রকারভেদ গুলি হল-

১. ইতিহাসগত পটভূমি

২. উপযোগমূলক পটভূমি

৩.সাংকেতিক পটভূমি

৪.পটভূমিসর্বস্বতা

৫.মানসিক পটভূমি

৬.বিচিত্রদৃষ্ট পটভূমি

১. ইতিহাসগত পটভূমি –

ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখা যায় ইতিহাসগত পটভূমি, এ ধরনের উপন্যাসে একটি বিশেষ দেশকালের নিরিখে পটভূমি সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রেক্ষাপটে প্লট ও চরিত্রের বিন্যাস গড়ে ওঠে। কখনো ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে চরিত্র ও প্লট সর্বজনীনতার উন্নীত হয়, পটভূমির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায় আবার কখনো পটভূমি জীবন্ত হয়ে ওঠে সেখানে চরিত্র এবং প্লট তুচ্ছ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক পটভূমি তথ্য ও চরিত্রের বর্ণনা এ সার্থক হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রে চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' তে।

২. উপযোগমূলক পটভূমি -

উপন্যাসে এই ধরণের পটভূমির খুব বেশি গুরুত্ব নেই। ঘটনা ও চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য এই পটভূমির উপযোগিতা। এই ধরনের পটভূমি চরিত্র ও কাহিনি নির্মাণ ছাড়া অতিরিক্ত গুরুত্ব থাকে না।

৩. সাংকেতিক পটভূমি –

যে পটভূমি মানব মনের নানা আবেগ অনুভূতির দ্যোতক হয় এবং তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যনিসর্গ যুক্ত হয় তাকে বলা হয় সাংকেতিক পটভূমি। সাংকেতিক পটভূমির উপস্থাপনা যত সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাময় হবে তত ভালো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে একদিকে পদ্মা নদী সংলগ্ন মানব জীবনের সংগ্রাম চিত্র অপরদিকে হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপের আশ্চর্য কল্পনা সাংকেতিক পটভূমি সৃষ্টি করে।

৪. মানসিক পটভূমি –

উপন্যাসে চরিত্রের যে পটভূমি থাকে তার সমান্তরাল বা বিপরীতধর্মী আর এক পটভূমি থাকে যা তার মানসলোকে থাকে, যে পটভূমিতে স্মৃতি- স্বপ্ন -মনোজগতের নানা চিত্র প্রকাশ পায় তাই হল মানসিক পটভূমি। এটি চরিত্রের দ্বিতীয় পটভূমি। যেমন- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’র অপু ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের যৌবনকালে এসেও নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন তার মানসিক পটভূমিতে ধারণ করে আছে।

৫. বিচিত্ররূপী পটভূমি -

আধুনিক উপন্যাসে একসাথে নানা জগতের ছবি ফুঁটে ওঠে। বিশেষত চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাসে একইসঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এর বিচিত্র ও বহুমুখী জগত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ‘অন্তঃশীল’ র খগেন বাবু ‘একদা’র অমিত এরা সবাই বিচিত্রদৃষ্ট পটভূমির জগতে বিচরণশীল।

৬. উপন্যাসে পটভূমিসর্বস্বতা -

অনেক উপন্যাসে দেখা যায় চরিত্র ও ঘটনার তুলনায় পটভূমির আধিক্য।পটভূমি হয়ে ওঠে চরিত্রের বিষয়বস্তু।সমালোচকের অভিমত, 'আরণ্যক'-এ অরণ্যপটভূমি একটি বিস্ময়মিশ্রিত মুগ্ধতার দৃষ্টিতে দেখা বিষয়বস্তু মাত্র, জীবনজিজ্ঞাসাবর্জিত পটভূমিসর্বস্ব চলচ্চিত্র মাত্র। এ জাতীয় পটভূমিসর্বস্ব কাহিনির নিজস্ব একটি মূল্য আছে একথা ঠিক কিন্তু উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা কতখানি তা বিচার্য বিষয়।'

৩.৫ : সংলাপ

নাটক পুরোপুরি নির্ভর করে সংলাপের ওপর, উপন্যাসের সংলাপ নাটকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ নয় ঠিকই তবু কাহিনির বিন্যাসে,চরিত্রের উন্মোচনে সংলাপের বিশেষ ভূমিকা আছে। হাডসনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়- ' Dialogue ,well - managed,is one of the most delightful elements in a novel'. Cuddon সংলাপ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'Two basic meanings maybe distinguished,a) the speech of characters in any kind of narrative, story or play,b) a literary genre in which 'characters' discuss a subject at length.

সংলাপ চরিত্রানুযায়ী না হলে তা অর্থবোধক হবে না।শিপলে ব্যাখ্যা করেছেন-

'Through the dialogue ,the persons are balanced one against another ,thus each the more fully portrayed' তিনি আরো বলেছেন - 'In fiction ,furthermore,it adds variety, relief and greater naturalness;by the necessary shift to the present tense,it brings the action nearer,makes it seem more swift and more intense'.

সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্মানস বৈশিষ্ট্য গুলি প্রকাশ পায়, উপন্যাসের চরিত্র অনুযায়ী ভাষারীতি নির্ধারণ করে সংলাপ রচনা করতে হয় আবার উপভাষায় ও

সংলাপ রচনা করতে হয়,সংলাপ রচিত হতে পারে দৈনন্দিন কথ্য ভাষারীতি তে, আবার 'উপভাষা'তেও সংলাপ রচনা করা যায়। কখনো ব্যাকরণের উদ্দেশ্যমূলক বিচ্যুতি, কাব্যময়তা, শব্দ ব্যবহারে অভিনবত্ব, চরিত্রের সংলাপের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। উনিশ শতকে উপন্যাসে সাধু গদ্য রীতি প্রচলিত ছিল যা এখন প্রায় বর্জিত, সাধারন মানুষ যদি উপন্যাসের বিষয় হয় তাহলে সংলাপের স্বাভাবিকতা আসে কথ্য ভাষায়।

৩.৬ : প্রতীকের ব্যবহার

কবিতা, চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতিতে যেমন প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় এবং তা নির্দিষ্ট তাৎপর্য বহন করে উপন্যাসে তেমনি প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়, প্রতীক সবসময়ই একটি বার্তা বহন করে যা কখনো সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় আবার কখনো তা দুরূহ। ভার্জিনিয়া উলফ এর 'Lighthouse' এর লাইটহাউস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র পুতুল নাচ প্রভৃতি রূপক অর্থের সীমা ছাড়িয়ে তা প্রকাশ করে উপন্যাসের ভাব জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানবমনের চেতন ও অচেতন স্তরের দ্বন্দ্ব কিভাবে পুতুলনাচের ন্যায় মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা নিয়ে উপন্যাসটি। সবাই যেন পুতুলের ন্যায়, কুসুমের বাবা অনন্তর মন্তব্যে –'মানুষ সংসারে চায় এক, হয় এক, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তার বাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন'।

৩.৭ : শৈলী ও ভাষা

উপন্যাস হল কথাসাহিত্যের একটি অঙ্গ। ঔপন্যাসিক কথা সাজিয়ে জীবনের বহু বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত আনন্দ-বেদনার নানা চিত্র ফুটিয়ে তোলেন উপন্যাসে।যেভাবে একজন লেখক তাঁর ভাষা কে ব্যবহার করেন চিত্রকল্প, প্রতীক, অলংকার ব্যবহার করে তা তার নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী কে চিহ্নিত করে।

লাতিন শব্দ Stilus থেকে এসেছে স্টাইল(Style) , stilus হল এক লেখন যন্ত্র আর স্টাইল বলতে বোঝায় শব্দ সাজিয়ে বাক্যে এবং বাক্য দিয়ে সমগ্র ন্যারেটিভ। মিডলটন

মারি শৈলির প্রসঙ্গে বলেছেন – শৈলী বিচার এর ক্ষেত্রে প্রথমে বিচার্য বিষয় শব্দ প্রয়োগ।এই শব্দপ্রয়োগ তিন প্রকার,যথা – আনুষ্ঠানিক, নিরপেক্ষ এবং আটপৌরে। অনুষ্ঠানে শব্দ প্রয়োগে বাক্য গঠনের সঠিক নিয়ম পালিত হয় এবং শব্দ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং গভীর হয়। 'নিরপেক্ষ' পদ্ধতিতে সাধারণ সহজ শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং আটপৌরে শব্দেরা স্ল্যাং এর সীমারেখা ছুঁয়ে যায় তখন তা আটপৌরে শৈলী।

ভাষা -

উপন্যাসের ভাষারীতির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কখনো উপন্যাসের ভাষা বর্ণনাধর্মী হয়,কখনো বিশ্লেষণাত্মক কখনো বা কাব্য মন্ডিত কখনো আবার সংলাপ নাট্য দ্বন্দ্ব সংঘাতমূলক। যে কোন উপন্যাসেই তার ভাবসত্য প্রকাশ পায় ভাষার যথার্থ ব্যবহারে। বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রণ এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত উপন্যাসটির ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফ্লবেয়ার এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"If you know exactly what you want to say you will say it well"

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন- লেখকের জীবন দৃষ্টি এবং দর্শনের সঙ্গে ভাষার ওতপ্রোত সম্বন্ধ।বাক্য- যোজনায়, শব্দ -প্রয়োগে, বর্ণনায় এবং চিত্রকল্প নির্মাণে সর্বত্র ঔপন্যাসিকের বৃহৎ কল্পনা ক্রিয়াশীল বলে সমালোচনায় বহুধা বিস্তৃত ব্যবহারে এরাও নব নব তাৎপর্যের দ্যোতক।" মধ্যবিত্ত রুচিপূর্ণ ছাত্রী উপন্যাসের নায়িকা এবং তার প্রেম 'তিথিডোর' উপন্যাসের বিষয়, এই উপন্যাসে ভাষার কারুকার্য প্রশংসনীয়, ভাষার লাবণ্য যুক্তিসঙ্গত পরিণতিদান করেছে। 'গোরা' উপন্যাসে ভাষার মৌলিকতা দেখা যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাসের তীরবর্তী মানব জীবনের অস্তিত্ব তার ভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক কাব্যিক ভাষায় সেই নদী ও তার পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবন ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় বাচনভঙ্গির বিশিষ্ট প্রায় উজ্জ্বল, তার ভাষা ভঙ্গি যেন তার চরিত্র।

এছাড়াও উপন্যাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল

ক. আখ্যানভাগের বর্ণনারীতি - উপন্যাসের আখ্যানভাগ বর্ণনায় উপন্যাসিক তিন ধরনের রীতি বেছে নিতে পারেন, উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ। কোন প্রেক্ষিতে কি জাতীয় কাহিনী হবে সেই আখ্যানে লেখক এর উপস্থিতি কতটা তার উপর নির্ভর করে আখ্যানভাগ এ বর্ণনারীতি।

খ. উপন্যাসে বাস্তবতা - উপন্যাসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনি উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, তবে সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞাতা থেকে উপাদান সংগ্রহ হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতায় ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে কল্পনার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলেন তাই উপন্যাসে বাস্তবতা সৃষ্টি করে। যেমন - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’।

গ. ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন - ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয় কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণের মধ্যে। কোন একটি চরিত্রের মধ্যে লেখক তার জীবন ভাবনা ব্যক্ত করেন। উপন্যাসের পটভূমি ও আগ্রহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে একটি পরিচ্ছেদে জীবন বিষয়ক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে ‘পুতুল' প্রতীকী ব্যঞ্জনায় জীবনের অসহায়তা ব্যক্ত করেছেন। ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন তার সীমা অতিক্রম করে উপন্যাসকে পৌঁছে দেয় সার্বজনীনতায়।

৩.৮ : প্রশ্নোত্তর

১. উপন্যাসের মূল উপাদান গুলি কি কি?

উত্তর – আখ্যানভাগ, চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি এবং শৈলী ও ভাষা।

২. অনিবার্যতার নিরিখে প্লটকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর- দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক. শিথিল প্লট এবং খ.দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট।

৩. কাহিনির ঐক্যের নিরিখে উপন্যাস কত রকমের হয়ে থাকে?

উত্তর- সরল প্লট(Simple), ও জটিল (Complex) বা যৌগিক (Compound)

৪. চরিত্র কাকে বলে?

উত্তর – যাদের নিয়ে কাহিনি গড়ে ওঠে তাদের বলে সেই উপন্যাসের চরিত্র।

৫. চরিত্রকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর- দুটি, ক. নির্বিশেষ বা টাইপ চরিত্র, খ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র।

৬. ইতিহাসগত পটভূমির উদাহরণ দাও?

উত্তর – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ‘রাজসিংহ'।

৭. সাংকেতিক পটভূমি উদাহরণ দাও?

উত্তর- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি'।

৮. শৈলীবিচারে শব্দপ্রয়োগ কয় প্রকার হতে পারে?

উত্তর- তিনপ্রকার, ক.আনুষ্ঠানিক, খ.নিরপেক্ষ, গ.আটপৌরে।

৯. কোন শব্দপ্রয়োগে সাধারণ ও দৈনন্দিন শব্দ সহজ ও সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর- নিরপেক্ষ শব্দপ্রয়োগে।

১০. আখ্যানভাগের নির্মানে ঔপন্যাসিক কী কী ধরণের রীতি বেছে নেন?

উত্তর- উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ।

৩.৯ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. উপন্যাসের মূল উপাদান গুলির নাম লিখে যে কোন তিনটি উপাদান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কর।

৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর – সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ – কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

৩. সাহিত্যের রূপভেদ -শুভঙ্কর ঘোষ।

একক ৪ - বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

৪.১ : আঞ্চলিক উপন্যাস

৪.১.১ : হাঁসুলীবাঁকের উপকথা – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭)

৪.১.২ : পদ্মা নদীর মাঝি – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৫)

৪.১.৩ : ঢোড়াই চরিত মানস – সতীনাথ ভাদুড়ী (প্রথম চরণ ১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১)

৪.১.৪ : উপনিবেশ - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (প্রথম খন্ড ১৯৪২, দ্বিতীয় খন্ড ১৯৪৫, তৃতীয় খন্ড ১৯৪৬)

৪.১.৫ : বনপলাশীর পদাবলী – রমাপদ চৌধুরী (১৯৬০)

৪.২ : সামাজিক উপন্যাস

৪.২.১ : কৃষ্ণকান্তের উইল – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮)

৪.২.২ : চতুরঙ্গ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬)

৪.২.৩ : পল্লীসমাজ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬)

৪.২.৪ : পুতুল নাচের ইতিকথা - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯৩৬)

৪.৩ : প্রশ্নোত্তর

৪.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

৪.১ : বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনা

৪.১.১: 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭)

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় আঞ্চলিকতা ও কাহিনির সমন্বয় দেখা যায়। কোপাই দহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহাদের সংস্কার, লোক কল্পনা, উপকথা বর্ণিত হয়েছে, শিমূল, বেলবন, শ্যাওড়াবন চন্দ্রবোড়া সাপ- এসবে দেবত্ব আরোপ, লৌকিক কুসংস্কার তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে আঞ্চলিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে চললেও পাখী ও করালীর চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা লক্ষণীয়। উপন্যাসের শুরুতে এখানকার অধিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়-

" কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাসুলিবাঁক - অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে,সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গহনার মত।... নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাদি লাট্ জাঙ্গলের অন্তর্গত। বাশঁবাদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধান চাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাদি ছোট গ্রাম;দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে

ভদ্রলোকের সমাজ- কুমার -সদগোপ, চাষী- সদগোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর এবং তন্তবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড়।" বনোয়ারি ও করালীর দ্বন্দ্ব নবীন-প্রবীণের সংঘাত, করালি কাহার দের সব আচরণ পালন করলেও তার মধ্যে অলৌকিক বিশ্বাস নেই। তবে করালি আধুনিক হলেও হাসুলীবাঁকের সাথে গভীরভাবে যুক্ত, - "হাসুলীবাঁকে করালী ফিরছে।সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁড়ছে।" নানা আঞ্চলিক অনুষ্ঠান আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে পরিণত করেছে।

৪.১.২: 'পদ্মা নদীর মাঝি' - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৫)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর এর মানুষের জীবনযাত্রা মাঝি ও ধীবরদের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা , কামনা- বাসনা, আবেগের ছবিটি চিত্রিত হয়েছে।তাদের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা ও মাঝিগিরি করা। বর্ষাকালে তারা পদ্মার বুকে ইলিশ মাছ ধরে আর শীতে মাল বহন ও খেয়া পারাপারের কাজ করে। রহস্যময়তায় আবৃও চরিত্র হোসেন মিয়া এবং তার ময়নাদ্বীপ। নিছক পটভূমি নয় পদ্মা যেন স্বতন্ত্র্য এক চরিত্র হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। পদ্মা তীরবর্তী ধীবর পল্লীতে বাস্তব জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হয়, যাদের নৌকা আছে তাদের বাদ দিলে বেশিরভাগ মানুষই অসহায় ক্ষুধার তাড়নায় দিনযাপন করে। আঞ্চলিক পটভূমিতে নদী তীরবর্তী মানুষের কাহিনী তাদের আঞ্চলিক ভাষা এবং চরিত্র-চিত্রন উপন্যাসটিকে জীবন্ত রূপ দান করেছে।

৪.১.৩: ঢোঁড়াই চরিত মানস – সতীনাথ ভাদুড়ী (প্রথম চরণ ১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১)

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক ভাবনার যুগ্ম প্রকাশ লক্ষণীয়। বিহারের অন্তর্গত জিরানিয়া শহর থেকে চার মাইল দূরে তাৎমাটুলির চিত্র প্রকাশিত। এখানকার বাসিন্দা বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই, শৈশবে তার পিতা মারা যায়

এবং তার মা পুনরায় বিবাহ করেন। বৌকা বাওয়া তাকে পালন করে, ঢোঁড়াই রামাইয়া কে বিয়ে করে কিন্ত রামাইয়া তাকে ছেড়ে চলে যায়। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলি ছেড়ে নতুন বৃত্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, দেশচেতনা তার অন্তরে বড় হয়ে ওঠে। গ্রামের কিশোর ঢোঁড়াই এর চরিত্রের পরিবর্তন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "বিহারের গ্রামাঞ্চল তার সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে এ উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। তুলসীদাসজীর রামচরিত মানসের শ্লোক আবৃত্তিতে মুখরিত হয়েছে পরিবেশ।বৌকা বাওয়া,রেবণ গুণী, ধনুয়া মাহাতো, রতিয়া ছড়িদার, বাবুলাল চাপরাসী, আর জোয়ান ছোকরার দল (ঢোঁড়াই, শনিচরা,বিরসা,শুক্রা,এতোয়ারী), রামিয়া, ফুলঝরিয়া, ঢোঁড়াই-দুখিয়ার মা,মাহাতো গিন্নী,গুদরমাই প্রমুখ পুরুষ ও নারী চরিত্র চাষবাস, হাটবাজার,জমিদার মহাজন,পুলিশের অত্যাচারের নানা ঘটনা,ভীরু লোভী নির্বোধ অসহায় মানুষগুলির ভুলভ্রান্তি দুর্বলতার নানা ছবি- সবটা মিলিয়ে এক আশ্চর্য জগৎ আমাদের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, যা ভৌগলিক সীমা -সংহতিতে আবদ্ধ,সেখানে মানবমনের উপর প্রকৃতি ও অলৌকিক ধারণা সংস্কারের অখণ্ড প্রতাপ,যেখানে জীবনস্বাদের অনন্যতার মধ্য দিয়ে এক সার্বভৌম সত্যের ইশারা।" ('কালের প্রতিমা'- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।)

৪.১.৪: উপনিবেশ – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়(প্রথম খন্ড ১৯৪২, দ্বিতীয় খন্ড ১৯৪৫, তৃতীয় খন্ড ১৯৪৬)

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' নদীমাতৃক চর ইসমাইলের কাহিনী। চর ইসমাইলের আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশে উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিকাশ লাভ করেছে, প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানব জীবন। ডি-সুজা, লিসি, জোহান, গঞ্জালেস, এসব চরিত্র পর্তুগিজ রক্তধারার আদিম নৃশংসতা নিয়ে চর ইসমাইলের দ্বীপে বাস করে, অন্যদিকে তহশিলদার মনিমোহন বলরাম, কবিরাজ, মুক্ত হরিদাস পোস্টমাস্টার, গাজী সাহেব প্রভৃতি বাঙালি মধ্যবিত্ত চরিত্র চাকরি ও ব্যবসার কারণে এই দ্বীপে থাকে। এই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত তবে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস নয়।

৪.১.৫ : বনপলাশীর পদাবলী – রমাপদ চৌধুরী (১৯৬০)

রমাপদ চৌধুরীর অন্যান্য উপন্যাস গুলির তুলনায় 'বনপলাশীর পদাবলী' আয়তনে বড়। বহু চরিত্র ও বহু ঘটনার সমাহার উপন্যাসে দেখা যায় এটি কোন পদাবলী নয় মানুষেরই গল্প। উপন্যাসের চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ, ভালো খারাপ উভয় দিকই বর্তমান। এই গ্রামে উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসেছে অবিনাশ ডাক্তার, এখানে প্রধান চরিত্র বনপলাশী গ্রাম। তাকে ব্যক্ত করেছে নানা চরিত্র ও ঘটনা। সবচেয়ে স্বতন্ত্র্য চরিত্র অট্টামা, সে নির্ভুল প্রতিনিধিত্ব করেছে এই গ্রামের পুরুষরা বাউন্ডুলে কিন্তু বধূরা ঐতিহ্য ও কুলমর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে আসীন।অট্টামার জন্য বনপলাশী জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'বনপলাশীর পদাবলী' কে আধুনিক সময়ের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা যায়।

৪.২ : সামাজিক উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা করা হলো -

৪.২.১: কৃষ্ণকান্তের উইল - (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে সৃষ্ট। 'বিষবৃক্ষে'র বর্ধিত রূপ হল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই উপন্যাসের মূল ঘটনা গোবিন্দলাল এবং তার স্ত্রী ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে সুন্দরী রূপসী রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের রূপজ আসক্তি। রোহিণীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখে গোবিন্দলাল তাকে হত্যা করে এবং নিজের ভুল বুঝতে পারে, এরপর ভ্রমরের মৃত্যু হলে গোবিন্দলাল ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করেন। সমালোচক সোহরাব হোসেন বলেছেন- "এই কাহিনীর নায়ক- সমাজ এবং সময়. কেননা জমিদার পুত্র সুন্দরী রমণী তে আসক্ত হয়ে তাকে রক্ষিতারূপে গ্রহণ অতিপরিচিত পুরনো বিষয় হলেও এখানে তা নব্যযুগের

সামাজিক এবং মানবিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত এবং আধুনিক যুগে নীতিবোধ ও নীতি চেতনা দ্বারা দৃষ্ট।"

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন – "কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, ইহা বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। রোমান্সের বিশাল জগৎ হইতে সামাজিক জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বঙ্কিমের প্রতিভা এই নূতন সংযম বন্ধনের মধ্যে একটা অসাধারণ দৃঢ় ও পেশীবহুল শক্তি লাভ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দ বিহার বিসর্জন দিয়া তৎপরিবর্তে এক নূতন বিশ্লেষণ গভীরতা অর্জন করিয়াছে।"

৪.২.২ : চতুরঙ্গ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬)

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাস গুলির মধ্যে 'চতুরঙ্গ' তার স্বাতন্ত্র্যে এক অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে। 'চতুরঙ্গে'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন এই বইখানির নাম 'চতুরঙ্গ'। 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী', ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।" উপন্যাসটি শচীশের জীবনধারার সঙ্গে দামিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা, শচীশের আত্ম স্বরূপ অন্বেষণের কাহিনী এবং আত্ম উপলব্ধি ও মুক্তি এই সামাজিক উপন্যাসটি কে আধুনিক করে তুলেছে। সমালোচক সোহরাব হোসেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আধুনিকতা সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন-

ক. 'চতুরঙ্গ' প্রথমত সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের নায়ক সংস্কারকে ভেঙে দিয়েছে। এতদিন সামাজিক উপন্যাসে যারা নায়ক হত তারা সামাজিক কারণেই ছিল ব্রাহ্মণ কিন্ত শচীশ কায়স্থ - সোনার বেনে। এতদিন বাংলা উপন্যাসের নায়কেরা ছিল আস্তিক শচীশ সেখানে ঘোর নাস্তিক।

খ. এতদিন সামাজিক উপন্যাসে ভৌগোলিক স্থানকালের একটি নির্দিষ্ট রূপ চিত্র অঙ্কিত হত। 'চতুরঙ্গ' সে অর্থে কোন বিশেষ ভৌগোলিক স্থান-কালের নামই নেই। তা সীমা নয় অসীমের ব্যঞ্জনাবাহী কাহিনী।

গ. চতুরঙ্গ ভাষার ওপর বিশেষ জোর পড়েছে ভাষা ও সংলাপ এখানে দর্পণের মত ব্যবহৃত, সংলাপের দর্পণে চরিত্রের জন্মান্তর তথা রূপান্তর এখানে সাধিত হয়েছে। ঘটনা এখানে বড় কথা নয়।

শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসেবেই নয়, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি এক অসাধারণ উপন্যাস।

৪.২.৩: পল্লীসমাজ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬)

সামাজিক উপন্যাসের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস হল 'পল্লীসমাজ'।এই উপন্যাসটিতে কুয়াপুর গ্রামের নানা সামাজিক সমস্যা, বিরোধ, বৈষয়িক কলহ, স্বার্থপরতা হিংসা, চক্রান্ত, প্রভৃতি এই উপন্যাসের উপজীব্য।শহরে বড় হওয়া রমেশ পিতা মৃত্যুতে গ্রামে ফেরে। গ্রামের উন্নতির লক্ষ্যে আশাবাদী রমেশ তার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও বেনী ঘোষাল সহ কয়েকজন মাতব্বরের চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে জেলে যেতে হয় এবং যখন সে গ্রাম থেকে চলে যেতে চায় তখন গ্রামের লোকেরা রমেশকে স্বীকৃতি জানায়। এই উপন্যাসের সামাজিক কারণে রমা ও রমেশের ভালোবাসা পরিণতি পায়নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- " রমা কি পল্লীসমাজ কে জানে? সেই সমাজ তার মনের মধ্যে কি কোন দ্বন্দ্ব সৃজন করেছিল, না, সে শুধু সে সমাজকে মানে। সে শুধু অখন্ড জীবনের দাসী মাত্র, এ অবস্থায় রমেশকে দেখামাত্রই যখন তার প্রেমের বোধে জোয়ার এল তখন থেকেই তার মনের মধ্যে শুরু হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ সত্তার দ্বন্দ্ব।" (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর)

অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন – " রমা ও রমেশের ভালোবাসার ব্যর্থতা দেখাইয়া তিনি পাঠকের মনে যে বেদনা ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাতেই তাঁর শিল্প সমাজ বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।' (শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার)

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে পল্লীসমাজের পরিবার জীবনে শরিকী বিরোধ, প্রেম সম্পর্কে সমাজ বিধি, কল্যাণমূলক কাজে বেনী ঘোষালের বাধা প্রদান, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রকৃতি দিক থেকে উপন্যাসটিকে সামাজিক উপন্যাস বলতে দ্বিধা নেই।

৪.২.৪: পুতুল নাচের ইতিকথা – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা সার্থক সামাজিক উপন্যাস হল 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। গাউদিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনী, শশী ও কুসুম এর সম্পর্ক, অপ্রাপ্তিবোধ, শশীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, মূল কাহিনীর পাশাপাশি মতি – কুসুম, নন্দ - বিন্দুর উপকাহিনী উপন্যাসে দেখা যায়। চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্ব, পুতুলের ন্যায় মানুষের নিয়তির কাছে পরাজয় প্রভৃতি এই উপন্যাসের কাহিনীকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। উপন্যাসের নায়ক শশীর চোখ দিয়েই ঔপন্যাসিক সমাজের ক্ষত গুলি চিহ্নিত করেছেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন – "আমাদের এই কিম্ভূতকিমাকার গঠনের ঔপনিবেশিক জীবনে কলকাতা এবং গাওদিয়ার মাঝে যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান শশী -কুসুমের সম্পর্ক তারই প্রতীক।"

সুতরাং বলা যেতে পারে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি সার্থক সামাজিক উপন্যাস।

৪.৩ : প্রশ্নোত্তর

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'।

২. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস টি কে লিখেছেন?

উ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. ‘বনপলাশীর পদাবলী’ কার লেখা?

উ: রমাপদ চৌধুরী র।

৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস কে লেখেন?

উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা।

৫. বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘চতুরঙ্গ’,’শহরতলী’,’পুতুল নাচের ইতিকথা’ প্রভৃতি।

৪.৪ : আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস ও একটি সামাজিক উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা কর

৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১. ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২.‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. ‘প্রবন্ধ সঞ্চয়ন’- ড: সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার।

একক ৫ - বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

৫.১ : ঐতিহাসিক উপন্যাস

৫.১.২ : রাজসিংহ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২)

৫.১.৩ : পদসঞ্চার- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৫৪)

৫.১.৪ : তুঙ্গভদ্রার তীরে- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯৬৫)

৫.১.৫ : লালকেল্লা- প্রমথনাথ বিশী (১৯৬৩)

৫.২ : রাজনৈতিক উপন্যাস

৫.২.১ : গোরা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১০)

৫.২.২ : জাগরী - সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯৪৫)

৫.২.৩ : পথের দাবী- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৯২৬)

৫.২.৪ : অরণ্যের অধিকার - মহাশ্বেতা দেবী(১৯৭৯)

৫.২.৫ : হাজার চুরাশীর মা- মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৪)

৫.৩ : প্রশ্নোত্তর

৫.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

৫.১ : ঐতিহাসিক উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা করা হল-

৫.১.১: 'রাজসিংহ' – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২)

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে 'রাজসিংহ'র নাম সবার প্রথমে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের 'চতুর্থ সংস্করণ এর বিজ্ঞাপনে' জানিয়েছিলেন – "আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর'বা 'সীতারাম' কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনী ঐতিহাসিক। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, উদিপুরী, ইত্যাদি ঐতিহাসিক চরিত্র। উপন্যাসের প্রয়োজনে যেসব অনৈতিহাসিক চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন সেগুলি হল- মানিকলাল, যোধপুরী বেগম, মুবারক, দরিয়াবিবি, নির্মলকুমারী, চঞ্চলকুমারী ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে যে দুটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন সে দুটি গ্রন্থ হল-

১. Annals and Antiquities of Rajasthan – James Tod.

২. The General History of the Mogol Empire – Catrou

'রাজসিংহ' উপন্যাসে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এবং রাজপুত বীর রাজসিংহের সংঘাতের প্রকাশ। উপন্যাস টি আটটি খন্ডে বিভক্ত, মূল বিষয় সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন- "হিন্দুদের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি 'রাজসিংহ' লইয়াছি।" যে কাহিনির সূচনা রাজস্থানের রূপনগর প্রাসাদ থেকে তার সমাপ্তি ঘটেছে ঔরঙ্গজেব এর সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে। রাজসিংহ ঔরঙ্গজেব'এর ঐতিহাসিক যুদ্ধের

পাশাপাশি মুবারক জেবউন্নিসার প্রণয়কাহিনী- ইতিহাস ও কল্পনার সমণ্বয় লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসটিতে। মবারক জেবউন্নিসার প্রণয় কাহিনী প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –" ইতিহাস এখানে মানবহৃদয় বিশ্লেষণকে অভিভূত না করিয়া তাহার অনুবর্তী হইয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

'রাজসিংহ' উপন্যাসে দুটি প্রধান চরিত্র – ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহ, উপন্যাসের নায়ক রাজসিংহ হলেও প্রধান চরিত্র ঔরঙ্গজেব।'রাজসিংহে'র মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্গত 'রাজসিংহ' প্রবন্ধে বলেছেন-

"তাহার এক-একটি খন্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে।প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি – তাহার পর ষষ্ঠ খন্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে,তাহার পর সপ্তম খন্ডে দেখি কতক- বা নদীর স্রোত, কতক- বা সমুদ্রের তরঙ্গ,কতক- বা অমোঘ পরিনামের মেঘগম্ভীর গর্জন,কতক- বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস কতক-বা কালপুরুষ লিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক- বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত- ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যপ্ত হইয়া গিয়াছে।" বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় 'রাজসিংহ' যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৫.১.২ : 'পদসঞ্চার'- নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৫৪)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ঘটনার যথাযথ সমন্বয় দেখা যায় এই উপন্যাসে। ডি-মেলোর বন্দী হওয়া, খোদাবক্স খানের শর্ত ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক চরিত্র গুলি হল – হেনরী, ভাস্কো - দা – গামা, আলবুকার্ক, গঞ্জালো, মামুদ, ফিরোজ শাহ, হুমায়ুন, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু পর্তুগীজদের ভারতে পদার্পণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্য লাভের চেষ্টা, এছাড়া হুসেন শাহের রাজত্বকালে

বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস বর্ণিত। বাংলা সমাজজীবন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা -সংস্কার, প্রভৃতি এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ইতিহাসে নিরস কাহিনীতে রসসঞ্চার করতে শঙ্খ -শম্পা- সুপর্ণার রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন- " ডি-মেলো, খোদাবক্স খাঁ, মামুদ শাহ, শের খাঁ এর ইতিহাস কাহিনীর সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাস কাহিনীটিকে শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এমনভাবে বুনেছেন যেন টানাপোড়েনের সুতোয় বোনা একটি বস্ত্র হয়ে উঠেছে। সুতরাং ' পদসঞ্চার' সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৫.১.৩ : তুঙ্গভদ্রার তীরে – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়র 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে তুঙ্গভদ্রার তীরে দুশো বছরের বিজয়নগরের ইতিহাস , তার ঐতিহ্য- ঐশ্বর্যকে স্মৃতিকথা হিসেবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। Robert Sewell এর 'A Forgotten Empire, ও রমেশ চন্দ্রের 'The Delhi Sultunate' গ্রন্থের সংশোধিত অংশ থেকে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। বিজয়নগরের রাজা বিদ্যুন্মালা, মনিকঙ্কণা, অর্জুন, কলিঙ্গের, রাজবৈদ্য, রসরাজ লক্ষণ মল্লপ ইত্যাদি চরিত্র উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের পরিসমাপ্তি আনন্দমুখর, মণিকঙ্কণার সঙ্গে দেবরায়ের, অর্জুনের সঙ্গে বিদ্যুন্মালা, বলরামের সঙ্গে মঞ্জিরা তিনটি বিবাহ দেখানো হয়েছে। ইতিহাসের প্রাধান্যর চেয়ে যুগ ও পরিবেশের সামগ্রিক চিত্র বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক বলেছেন- "আমার কাহিনী Fiction history নয়, Historical fiction।।" বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ' তুঙ্গভদ্রার তীরে' প্রশংসার দাবিদার।

৫.২.৪ : লালকেল্লা - প্রমথনাথ বিশী (১৯৬৩)

প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'লালকেল্লা' উপন্যাসটি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে তিনটি এবং তৃতীয় ভাগে দুটি খন্ড আছে। 'লালকেল্লা' উপন্যাসের পটভূমি

'দিল্লি'।বাহাদুর শাহ জাফরের জীবৎকাল এর সময়বৃত্ত। রাজনৈতিক অস্থিরতা, আগ্রাসী শাসন, মূল্যবোধের বিপর্যয় এই সময়টিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে একটি শীর্ষ পংক্তি আছে, বিখ্যাত কবিতা, নাটকের উদ্ধৃতি। উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হলো -জীবনলাল ও রুমালী। ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্রের সমাহারে, জীবন্ত সংলাপে উপন্যাসে ঐতিহাসিক রস সর্বত্র বজায় রয়েছে এবং এই রচনাটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস করে তুলেছে।

৫.২ : রাজনৈতিক উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা করা হল-

৫.২.১ : 'গোরা' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১০)

দেশকালের ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'গোরা' উপন্যাসটি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় উপন্যাসটি রচিত। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেছেন ঔপন্যাসিক। গণ-আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের কথা বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ধারণা ছিল ভিন্ন, তিনি রাজাদের কাহিনীকে ইতিহাসের প্রধান কাহিনী হিসেবে কখনো দেখাননি, সিপাহী বিদ্রোহ থেকে পঞ্চাশ বছরের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক দলিল। মহাকাব্যিক বিশালতা ও ব্যঞ্জনা মণ্ডিত 'গোরা' এক মহৎ উপন্যাস। সুকুমার সেন এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন – " 'গোরা'য় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের এবং ধর্মের সঙ্গে মানবসত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের নির্দেশ উদঘাটিত। ভারতীয় সংস্কৃতির উদার নিরপেক্ষতা, নিঃসঙ্গ ব্রাহ্মণ্যমহিমা, সার্বভৌম করুণা সর্বোপরি শান্ত সত্যনিষ্ঠা- এ সকল সত্বেও সমাজ ব্যবহারে বৈষম্য, আচার বিচারের নিগড় জাতিভেদের জঞ্জাল এবং জনসাধারণের নিঃসহায় দারিদ্র ও অপরিসীম মূঢ়তা যে দেশকে তিলেতিলে মহতী বিনষ্টির পথে লইয়া যাইতেছে - ইহা উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তাহার সমাধানের ইঙ্গিত

দিয়াছেন তা সত্য সত্যিই ভবিষ্যার্থকথা।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ') গোরার সংস্কারবদ্ধতা, ইংরেজ বিদ্বেষ স্বদেশী যুগের উন্মেষের রূপ তুলে ধরেছে এবং একটি সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

৫.২.২ : 'জাগরী' – সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯২৬)

বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক উপন্যাস গুলির মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' অন্যতম। পূর্ণিয়া প্রবাসী এক বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে ১৯৪২ এর অগাষ্ট আন্দোলনের এক বিশেষ ছবি ফুটে উঠেছে। পরিবারের কর্তা স্কুল শিক্ষক, গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণীত। তাই সে বাড়িতে গান্ধী আশ্রম এর প্রতিষ্ঠা করেন। তার স্ত্রী রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে খুব বেশি না জানলেও স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণীত। তাদের দুই সন্তান বিলু ও নিলু। আনন্দিত এই পরিবারে কেমন করে হতাশা নেমে আসে, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিভাবে পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে তা একটি রাতের ভয়াবহ কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসে বর্ণিত। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসির আসামি বিলু,সকাল হলেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তার বাবা-মা বন্দি বাইরে শুধু নিলু, কিন্তু রাজনৈতিক মতান্তরে নিলুই তার দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে তাই সে রাতে তার চোখও ঘুমহীন। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে 'জাগরী' উপন্যাসটি সার্থক।

৫.২.৩ : পথেরদাবী – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পথের দাবী' নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। এই উপন্যাসের পটভূমি স্বাধীনতা আন্দোলন, তার দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সব্যসাচীর মধ্যে। এই উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদের চিত্র উঠে এসেছে। সব্যসাচী সমাজবিপ্লবী, বস্তি বস্তি ঘুরে দরিদ্রদের সেবা করে। দরিদ্রদের জন্য স্কুল তৈরি করে, শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্য জাগরিত করে। এই উপন্যাসে নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ভাবনা এক দৃষ্টান্ত। সুমিত্রা বিপ্লবপন্থী, ব্রিটিশ সরকারের

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। অন্যদিকে ভারতী গান্ধীবাদী সে চরমপন্থী নীতিতে বিশ্বাসী নয়। কাল মার্কস এর মতই সব্যসাচীও বিপ্লব বলতে দ্রুত আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছে। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্বাসের উদাহরণ 'পথেরদাবী' উপন্যাস।

৫.২.৪ : অরণ্যের অধিকার - মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৯)

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার ', 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাস দুটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'অরন্যের অধিকার' উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিরসা মুন্ডার কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। লেখিকা ভূমিকায় বীরসা মুন্ডার সম্পর্কে লিখেছেন – " এ দেশের যে সামাজিক ও আর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশী সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডার ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বীরসা মুন্ডা ও তাঁর অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।

৫.২.৫ : 'হাজার চুরাশির মা' - মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৪)

সত্তর দশকের নকশালপন্থী আন্দোলনের সময় লেখা। উপন্যাসের ব্রতীর মতোই সেই সময় বহু যুবক শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আশায় সুখী জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু তারা পরিণত হয়েছিল একটি সংখ্যায়, যেমন ব্রতী হয় হাজার চুরাশী। ব্রতীর মা যখন ছেলেকে হারিয়ে তার ছেলের মত ব্রতীদের জগতের ঠিকানা খোঁজে তখন সুজাতার স্বামী ও পরিবারের অন্যান্যরা তাতে বাধা দেয়, অস্বীকার করে ব্রতীকে এবং নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট হয়। উপন্যাসের শেষে হাজার চুরাশির মা মেয়ের পাকা দেখার দিন তার নিঃশব্দ ঘৃণা ব্যক্ত করেন।

৫.৩ : প্রশ্নোত্তর

১. দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম এবং ঔপন্যাসিক এর নাম লেখ?

উ: 'রাজ সিংহ'- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. 'পদসঞ্চার' উপন্যাসটি কার লেখা এবং কি জাতীয় উপন্যাস?

উ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৩. 'গোরা' উপন্যাসটি কোন সময় লেখা?

উ: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়।

৪. 'জাগরী' উপন্যাসের দুই ভাইয়ের নাম কি?

উ: বিলু ও নিলু।

৫. মহাশ্বেতা দেবীর দুটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: 'হাজার চুরাশির মা' ও 'অরণ্যের অধিকার'।

৫.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যের দুটি রাজনৈতিক ও দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' - সুকুমার সেন।

একক – ৬ বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ও চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

৬.১ : মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

৬.১.১ : চোখের বালি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৬)

৬.১.২ : ঘরে বাইরে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬)

৬.১.৩ : গৃহদাহ- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০)

৬.২ : চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস

৬.২.১ : অন্তঃশীলা- আবর্ত-মোহনা- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৪৩)

৬.২.২ : একদা- গোপাল হালদার (১৯৩৯)

৬.২.৩ : জাগরী- সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯৪৫)

৬.৩ : প্রশ্নোত্তর

৬.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

৬.১ : মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হল -

৬.১.১ চোখের বালি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৬)

বাংলা উপন্যাসে ' চোখের বালি' থেকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা এ কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। তিনি বলেছেন- " শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।" (সূচনা 'চোখের বালি', রবীন্দ্র রচনাবলী)। তবে শিশির চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস পাঠের ভূমিকায় বলেছেন -

"ঔপন্যাসিক হিসেবে এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাইরের দৃশ্যমান জগত থেকে মানব মনের চিরন্তন লীলা চাঞ্চল্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের তুলনায় 'চোখের বালি'তেই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসেও এই দিকটি লক্ষ্যনীয়।

'চোখের বালি' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ হয়েছে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আঙ্গিকে। উপন্যাসটি ৫৫ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। চারটি নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই উপন্যাসের কাহিনী। এই চারটি চরিত্র হলো মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী, বিহারী। নীতিগত দিক থেকে বিচার না করে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। 'চোখের বালি'র প্রধান চরিত্র বিনোদিনী, সাহসী বিধবা এই নারীর মধ্যে কামনা-বাসনা, প্রতিহিংসা লক্ষ্য করা যায়। এক অপ্রাপ্তিবোধ তার চরিত্রের জটিল মনোজগতের পরিচয়বাহী। উপন্যাসের চারটি চরিত্রের তুলনায় বিনোদিনীর মনের টানাপোড়েন সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। বিনোদিনী আশা ও মহেন্দ্রর দাম্পত্য জীবনে সহজেই প্রবেশ করলেও মহেন্দ্রকে বিনোদিনী বলেছে – "ভীরু কাপুরুষ... না জানে ভালোবাসিতে না জানে কর্তব্য করিতে।... লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক

একবার ওদিক.... তোমার এই চোরের মত প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে।" বিনোদিনী নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছি নিজেকে- " যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে,যে মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রী রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীনবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে,তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে,তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই।একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো দশা হইয়াছে।আমি মরিতে চাই,কি মারিতে চাই,তাই বুঝিতেই পারিলাম না।" বিনোদিনী ঘটনাক্রমে বুঝতে পেরেছে বিহারীর প্রতি তার প্রেম ভাবনা প্রবল কিন্তু বিহারী তাকে প্রত্যাখ্যাত করে,কিন্ত যখন বিহারী বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন বিনোদিনী বলে- " এই ভালবাসার অধিকারে আমি আজ একটি স্পর্ধা প্রকাশ করিব।পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য তপস্যা করিব- এজন্য আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলতে পারিয়াছি-এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না... আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে - আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।...তুমি প্রসন্ন হও সুখী হও।"

চরিত্রের অন্তর্জগতের জটিলতা দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে সুস্পষ্ট। উপন্যাসটি আলোচনা করে তাই বলা যায় উপন্যাসটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের রূপলাভ করেছে।

৬.১.২ ঘরে বাইরে – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬)

অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গের উত্তাল পরিস্থিতিতে এই উপন্যাসটি রচিত। নিখিলেশ ও তার বন্ধু সন্দীপ একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সন্দীপ নিখিলের বাড়িতে আসে, সন্দীপের রাজনৈতিক আন্দোলনে সহযোগিতা করতে তাতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বিমলা, নিখিলেশ বিমলাকে

বিশ্বাস করে তাই তাকে নিঃসংকোচে সন্দীপের সাথে পরিচয় করিয়েছিল,নিখিলেশ বিমলাকে আধুনিক নারী গড়ে তুলতে চেয়েছিল ।সন্দীপ এবং নিখিলেশের মতাদর্শ এক হলেও সন্দীপ হিংসার পথকে বেছে নিয়েছে কিন্তু নিখিলেশ ভেবেছে মানুষকে বোঝাতে হবে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং তা কখনোই ধ্বংসাত্মক পথে সম্ভব নয়। সন্দীপের চরিত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়,সে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ত্যাগ স্বীকারের কথা বলতো এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জনের কথা বলতো কিন্ত সে নিজে আদৌও তা করতো না। অনায়েসেই বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করত। সন্দীপ মিথ্যে কথায় নারীদের চিত্ত জয় করতে চেয়েছে। বিমলার সাথে সে সম্পর্ক তৈরি করেছে, নিখিলেশের অর্থ নিয়ে অপচয় করেছে। স্বদেশী মন্ত্রের জ্বালে বিমলাকে মক্ষীরানী করে সে নিখিলেশের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল। বিমলার মনোজগতের নানা সংশয়, আশঙ্কা এবং অনুতাপ এই উপন্যাসটিকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছে।

৬.১.৩ গৃহদাহ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহৎ সৃষ্টি গৃহদাহ।সুরেশ এবং মহিম দুই বন্ধু কিন্তু তাদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অনেক। উপন্যাসে নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে সমস্যা, মহিম,অচলা, সুরেশের ত্রিকোণ প্রেম প্রভৃতি বর্ণিত। সমালোচক সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত এই উপন্যাসের অনন্যতা কারণ সম্বন্ধে বলেছেন- " ইহাতে নারী হৃদয়ের গভীরতম রহস্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস অদ্বিতীয়। কাহিনীর আরম্ভ, পরিণতি ও পরিসমাপ্তির মধ্যে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে "('শরৎচন্দ্র)। মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোলাচল চিত্ততা, শান্ত কঠিন স্বভাব, সুরেশের ব্যাকুলতা এসবের মধ্যে অচলার টানাপোড়েনের বিশ্লেষণ এই উপন্যাসটি কে সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস করে তুলেছে।

৬.২ : চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস

কয়েকটি চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাসের আলোচনা করা হল –

৬.২.১ অন্তঃশীলা - আবর্ত – মোহনা - ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৪৩)

'অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহনা' উপন্যাসটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে চেতনাপ্রবাহরীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা তাঁর রচনায় স্পষ্ট। এই উপন্যাসে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে Stream of Consciousness- মূলত খগেন বাবুর চিন্তাভাবনা, বুদ্ধি, শিক্ষা, রুচিবোধ প্রবাহরীতিকে স্মরণ করায়। সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দাহ দৃশ্য, রমলা দেবীর আতিথেয়তা,সুজন-বিজনের ঘনিষ্ঠতা,চেতনা প্রবাহের প্রসার ঘটিয়েছে। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের খগেন বাবু বলেছেন – " অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়। কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণী,কোথাও বা আবর্ত,এই তো জীবন।" খগেন বাবু স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর বান্ধবীর সঙ্গে গগনবাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে এই সন্দেহে সাবিত্রীর আত্মহত্যা এক জীবন সঙ্কট সৃষ্টি করে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন- " নায়ক খগেনবাবুর অন্তর্মুখী জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও আত্মজিজ্ঞাসার বিভিন্ন স্তর পরম্পরা মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। জীবনের নানা অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্যক্তিসত্তার মানস প্রতিক্রিয়া ও তারই মধ্য দিয়ে ব্যক্তির জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সন্ধানই সমগ্র আখ্যায়িকার লক্ষ্যবস্তু। তিনখানি গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই লেখকের সেই উদ্দেশ্যই ধরা পড়েছে মনে হয়। আত্মানুসন্ধানী এই নায়কের চিন্তা-চেতনার 'অন্তঃশীলা' পেরিয়ে শেষপর্যন্ত বিপুল জনজীবনের মোহানায় গিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য)।

৬.২.২ একদা – গোপাল হালদার (১৯৩৯)

গোপাল হালদারের ‘একদা’ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধকালীন বিশ্বে অবক্ষয়ী সমাজ ও সভ্যতার সংকট সেই সময় কার রচনা এই উপন্যাসটি। এরমধ্যে নব্য বস্তুবাদ এর প্রভাব, দেখা যায়। একটি দিনের মধ্যে পূর্ব স্মৃতির অনন্ত চিন্তার প্রবাহমানতা বয়ে গেছে।

৬.২.৩ জাগরী - সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯৪৫)

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন্যাসে একটি রাতের প্রেক্ষাপটে আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে অনিশ্চয়তা দুশ্চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। পরেরদিন সকালে ফাঁসি হবে বিলুর, আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে তার বাবা, ‘আওরাৎ কিতা’য় মা এবং নীলু জেলের বাইরে। মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে নীলু তার দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে, চারজনে নিদ্রাহীন এবং চারজনেই চিন্তিত। তাৎক্ষণিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রত্যেকটি চরিত্রের মানসিকতা ফুটে উঠেছে, বর্ণনার অসংলগ্নতা স্বগত কথনের দৃষ্টান্ত, বর্ণনায় তীর্যকতা, ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে উপন্যাসটি চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা লাভ করেছে।

৬.৩: প্রশ্নোত্তর

১. রবীন্দ্রনাথের দুটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: ‘ঘরে বাইরে’, ‘চোখের বালি’।

২. ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্রের নাম লেখ?

উ: মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী,

৩. ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসটি কার লেখা?

উ: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

৪. দুটি চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: 'অন্তঃশীলা- আবর্ত -মোহনা' ও 'জাগরী'।

৫.'একদা' উপন্যাসটি কার লেখা?

উ: গোপাল হালদারের।

৬.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস এর পার্থক্য নিরূপণ করে দুটি উপন্যাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করো।

৬.৫: সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. 'শরৎচন্দ্র' -সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৪. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

একক ৭ - বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পর্যায় আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

৭.১ : বঙ্কিম যুগ

৭.২ : বঙ্কিম যুগের অপ্রধান ঔপন্যাসিকগন

৭.৩ : উপন্যাসের ধারায় বাঁকবদল রবীন্দ্র উপন্যাস

৭.৪ : বাংলা উপন্যাসের ধারায় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭.৫ : প্রশ্ন উত্তর

৭.৬ : আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

৭.১ : বঙ্কিম যুগ

বাংলা উপন্যাসে যথার্থ সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দুর্গেশনন্দিনী’(১৮৬৫) থেকে তার যাত্রারম্ভ। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশের পূর্বে কয়েকটি নকশাধর্মী রচনা প্রকাশ পায় যা উপন্যাসের আভাসমাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবুবিলাস’(১৮২৫) ‘নববিবিবিলাস’(১৮৩১),কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’(১৮৬১), প্যাঁরিচাদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’(১৮৫৪), হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স এর ‘করুণা ও ফুলমণির বিবরণ’(১৮৫২), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’(১৮৫৭) প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৮)

"For art's sake alone I would not face, the toil of writing a single line ..." বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নাড শ'র যা সত্যোচ্চারণ,তা উনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রেরও সম্ভবত শাশ্বত বাণী। (ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্য পরিচয়')।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা গুলি হল- ইংরেজি রচনা 'rajmohan's wife' (১৮৬৮) Indian field পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে অসমাপ্ত থাকে।

রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাস- 'দুর্গেশ নন্দিনী'(১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা'(১৮৬৬), 'মৃণালিনী'(১৮৬৯), 'যুগলাঙ্গুরীয়'(১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর'(১৮৭৫), 'রাজসিংহ'(১৮৫২), 'সীতারাম'(১৮৮৭)।

তত্ত্ব ও দেশাত্ব মূলক- 'আনন্দমঠ'(১৮৮৪), 'দেবী চৌধুরানী'(১৮৮৫),

সামাজিক ও পারিবারিক– 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩), 'রজনী'(১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল'(১৮৭৮)

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট-

'দুর্গেশনন্দিনী' মোগল বিজয় নিয়ে লেখা। তুর্কি বিজয় নিয়ে লেখা 'মৃণালিনী' ইংরেজ ও মীর কাসেমের সংঘর্ষ 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী মোগল পতনের যুগান্তর কাল নিয়ে পরিকল্পিত হয়েছিল। সমকালীন সমাজের ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিক সংযোগ ও সম্পর্ক গুলি বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন ইতিহাসধর্মী এই সকল উপন্যাস লেখার সময়। সমালোচকের ভাষায়- "a real understanding for the problems of contemporary society can only grow out of an understanding of the society's pre-history and formative history"(George Lukacs : The Historical Novel 1965)

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমিষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক। মুঘল পাঠানের সংগ্রাম, মূল কাহিনী ইতিহাসাশ্রয়ী, বীরেন্দ্র সিংহ, কতলু খাঁ, জগৎসিংহ অভিরামস্বামী ইত্যাদি চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত। বিমলার পরিণাম এবং জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষার কাহিনী উপন্যাসের মূল বিষয়। তবে এই উপন্যাসে রোমান্সের প্রভাব বেশি।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' পাশ্চাত্য রোমান্সের বাংলা সংস্করণ। উপন্যাসটি চারটি খন্ডে বিভক্ত। নবকুমার- কপালকুণ্ডলার মূল কাহিনী ছাড়াও শ্যামা এবং মতিবিবি প্রসঙ্গ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' মুসলমান বঙ্গ বিজয়ের যুগের কাহিনী। বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে সপ্তদশ অশ্বারোহীর নুদিয়া জয়ের ঘটনায় লক্ষণ সেন চরিত্রের ঐতিহাসিক কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রকৃত সত্যানুসন্ধান, তবে কল্পনার আধিক্য উপন্যাসটির অন্তরায়।

মীরকাশেম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় স্থাপিত 'চন্দ্রশেখর' এর মূল কাহিনী কাল্পনিক। প্রতাপ শৈবলিনীর প্রণয় আকর্ষণ এবং চন্দ্রশেখরের আদর্শ চরিত্র এই উপন্যাসের বিষয়। মীরকাশেম, দলনী বেগমের উপকাহিনী রয়েছে।উপন্যাসের শেষে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিকরণের ঘটনাটি অনেক সমালোচক শিল্প গত সীমাবদ্ধতা বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কাহিনী ও চরিত্র ঐতিহাসিক। ঔরঙ্গজেবের ও রাজসিংহের যুদ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের বাহুবল প্রকাশ করা 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং রানা রাজসিংহের বিয়ে এবং চঞ্চল কুমারীকে বিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা,এর সঙ্গে তিনি জেবউন্নিসা মোবারক-দরিয়াবিবির কাল্পনিক উপকাহিনী যুক্ত করেছেন। ধর্মতত্ত্বের ভাবনায় 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী কল্পিত হয়েছে। 'আনন্দমঠে'দেশপ্রেম 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রসংগীত, 'দেবী চৌধুরানী'তে প্রফুল্লের মধ্যে গীতার নিষ্কাম কর্মের

ভাবাদর্শ এবং 'সীতারাম' এ হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ বর্ণিত হয়েছে। এইসব উপন্যাসের তুলনায় 'যুগলাঙ্গুরীয়'বা 'রাধারানী' উপন্যাস সার্থক নয়।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতির বিষয় সময় ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক বাস্তবতা। বঙ্গদর্শন পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- " বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে 'বিষবৃক্ষ' ।রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন- "এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ- পঁচিশ বৎসরকাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাহার সুদূর সাক্ষাত লাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবন ধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটি নতুন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী,কমলমনণি রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবালোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।" 'বিষবৃক্ষ'উপন্যাস মূলত সামাজিক সমস্যা বিধবা বিবাহ এবং বহুবিবাহকে তুলে ধরেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর কাহিনী সরল, কোন উপকাহিনি নেই। 'বিষবৃক্ষে'র কাহিনী জটিল, মূল কাহিনীর সাথে একাধিক কাহিনী যুক্ত হয়েছে।' রজনী' উপন্যাসে নানা জটিল ঘটনার মধ্যে নায়ক এবং অন্ধ রজনীর বিবাহ এবং কোন মহাপুরুষের কৃপায় তার দৃষ্টিশক্তি লাভ- এই হল উপন্যাসের মূল আখ্যান। এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন- " এ প্রথার গুন এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভালো লাগে সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।" বাংলা সাহিত্যের এই মহান ঔপন্যাসিক কাহিনী চরিত্র সৃষ্টি, ভাষা সম্পদের যে ঐশ্বর্য বাংলা সাহিত্যকে দান করেছেন তার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়।

৭.২ : বঙ্কিম যুগের অপ্রধান ঔপন্যাসিকগণ

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিম পরবর্তী ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গে লিখেছেন – "বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিচিত্র প্রতিভার সাহায্যে উপন্যাসের নানা শাখাপথ খুলে দিলেন তখন

লেখক-পাঠক কেউই এর আকর্ষণ দমন করতে পারলেন না। যিনি দু চার কলম লিখতে পারতেন তিনি ছোট-বড় উপন্যাস, 'রমন্যাস', নবেল, নবলেট লিখতে আরম্ভ করলেন। অধিকাংশ লেখক নিলেন ইতিহাসের সত্য, অর্ধসত্য, ও অতিরঞ্জিত ঘটনা। কেউ নিলেন দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গল্প কেউ বা ইংরেজি আখ্যান ফার্সি কিসসা ও সংস্কৃত গদ্য। রোমান্সের অনুকরনে বাংলা কাহিনী ফাঁদলেন। এদের অনেকেরই কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল না তাই এদের নাম আজ বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে। এদের মধ্যে যে দু-চারজনের যৎকিঞ্চিৎ রচনা শক্তি ছিল তাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা এখনো পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে বেঁচে আছেন আর যারা ততটা ভাগ্যবান নন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নামটা কোন প্রকারে টিকে আছে।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত).এখানে স্বল্প প্রতিভার কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করবো। এরা হলেন প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরে উপন্যাস সাহিত্যে যার নাম করা যেতে পারে তিনি হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি মোট ছ'টি উপন্যাস লিখেছেন। ' বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ'(১৮৭৭) ঐতিহাসিক পটভূমিতে রোমান্টিক কাহিনী। ঐতিহাসিক উপন্যাস – 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'(১৮৭৮) 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'(১৮৮৯)। সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস- 'সংসার' (১৮৮৬)এবং 'সমাজ'(১৮৯৪)। তার ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলিতে ইতিহাস অক্ষুন্ন আর সামাজিক উপন্যাস গুলি বিশেষ আদর্শ প্রচারমূলক।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রতিভা থাকলেও উদাসীনতার কারণে প্রতিভা সঠিকভাবে উন্মুক্ত হয়নি তাঁর উপন্যাস গুলি হল- 'জালপ্রতাপচাঁদ'(১৮৮৩), 'কণ্ঠমালা'(১৮৭৭), ' মাধবীলতা'(১৮৮৫),উপন্যাসের তুলনায় তার গল্প প্রবন্ধ অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যার উপন্যাস বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছায় তিনি 'স্বর্ণলতা'র লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তার উপন্যাস গুলি হল- 'স্বর্ণলতা(১৮৭৪)', 'ললিত সৌদামিনী'(১৮৮২), 'হরিষে বিষাদ'(১৮৮৭), 'অদৃষ্ট'(১৮৯২),।

৭.৩ : উপন্যাস ধারার বাঁকবদল : রবীন্দ্র উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) - রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ষোলো বছর বয়সে লেখা এই উপন্যাসে অপরিণতির ছাপ রয়েছে।তবে রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমী চেতনার অনুবর্তী নয় তা 'করুণা' উপন্যাসটি থেকেই বোঝা যায়। রবীন্দ্র উপন্যাসগুলি যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো-

ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস- 'বউ ঠাকুরানীর হাট'(১৮৮৩), ' রাজর্ষি' (১৮৮৭)

সামাজিক উপন্যাস- 'চোখের বালি'(১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'যোগাযোগ'(১৯২৯)

স্বদেশ চেতনা মূলক উপন্যাস- 'গোরা'(১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়'(১৯৩৪)

রোমান্টিক উপন্যাস– 'চতুরঙ্গ'(১৯১৬), 'শেষের কবিতা'(১৯২৯), 'দুই বোন'(১৯৩৩) 'মালঞ্চ'(১৯৩৪)

ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' তে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'বউ ঠাকুরানীর হাট' এ রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়,পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভার গল্প বর্ণিত, এর বেশিরভাগই অনৈতিহাসিক কাহিনি। কাহিনি বয়নে ও চরিত্র চিত্রণে সার্থকতার অভাব সুস্পষ্ট।

'রাজর্ষি' ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী নিয়ে লেখা। কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান বন্ধ করে দেওয়ায় রাজা ও পুরোহিত রঘুর মধ্যে দ্বন্দ্ব,দ্বন্দ্ব ক্রমশ জটিল পর্যায়ে পৌঁছায় এবং জয়সিংহের আত্মদানে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। পুত্রকে হারিয়ে রঘুপতির হাহাকারে স্নেহ প্রেম ভালোবাসার গভীরতা চিত্রিত হয়েছে। 'চোখের বালি' আগের উপন্যাসগুলির তুলনায় অনেকাংশে ব্যাতিক্রম, আধুনিকতার ছোয়া এই উপন্যাসে দেখা যায়। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী চারজনের জীবনের সমস্যা কিভাবে জটিল হয় এবং তার সমাধান এর বিষয়বস্তু। "রক্ষণশীল প্রগতিশীল এদেশের মানুষের চোখের সামনে জোড়া ভ্রু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন" নিয়ে সেদিন হিন্দু ঘরের তরুণী বিধবা বিনোদিনীর কামনার প্রকাশ যেন হঠাৎ এক দমকা বাতাসের মতো ধাক্কা দিয়েছিল। আর ঝড়ের দাপটে যে চোখ কর কর করবে এটাই স্বাভাবিক। সেই স্বভাবের দাবী বোঝাতে গিয়ে লেখক তার প্রেমপ্রবৃত্তির দাহ ও দীপ্তি কে কুণ্ঠাহীন ভাবে দেখিয়েছেন – "ক্ষুধিত হৃদয়া বিনোদিনী ও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম দেখা গেল প্রবৃত্তি নিরোধের নিয়মে নারী নিয়ন্ত্রিত হল না। আবার কেবল প্রবৃত্তি তৃপ্তির অন্বেষণ নয়, আশার সঙ্গে প্রতিতুলনায় আত্মমর্যাদা রক্ষার চিন্তায় তার অস্তিত্বের সংকটও এখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। কারন উপন্যাসের ভূমিকাতেই লেখক বলেছেন – "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"

'চোখের বালি' পরে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটিতে কোনো বৈচিত্র্য বা নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায় না। রমেশ নৌকাডুবির পর কোনোভাবে বেঁচে গেলও তার পাশে পরস্ত্রী কমলা পড়ে থাকে যে নববিবাহিত এবং তার নিজ স্বামীকে ঠিকমতো না চেনায় রমেশকে তার স্বামী ভাবে। অপরদিকে রমেশ ভালোবাসত হেমনলিনীকে কিন্ত উপন্যাসের শেষে কমলা ও তার আসল স্বামী নলিনাক্ষের মধ্যে মিলন ঘটেছে।

‘যোগাযোগ’, ‘বিচিত্রা’পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘তিন পুরুষ’নামে। মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও পরিণাম এর বিষয়। কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও পরিণাম এর বিষয়।যখন সে তার দাম্পত্য ছেদ করতে চাইছে তখন সে জানতে পারল সে সন্তানসম্ভবা। কুমুদিনীর মানসিক সংঘাত দেখানো হলেও তা একতরফা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ চেতনা মূলক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘গোরা’ উপন্যাসটি তার অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় বৃহৎ। স্বদেশের প্রকৃত স্বরূপ জানার আগ্রহ ছিল গোরার মধ্যে, একসময় সে নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু থাকলেও ঘটনাক্রমে যখন সে তার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত হয় এবং জানতে পারে সে আইরিশ, কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর পালিত পুত্র তখন রক্ষণশীল ভাবনার থেকে সে মুক্তি পায়। তার দেশপ্রেম ছিল খাঁটি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে বলেছেন – ‘গোরা’ চরিত্রের মেরুদন্ড তার ‘দেশপ্রেম’(এই শব্দটি কে সমালোচকেরা ব্যবহার করেছেন) কিন্তু একথাও আমাদের জানা আছে যে এই দেশপ্রেমের স্বরূপ বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত দেশপ্রেম থেকে পৃথক। ‘গোরা’র আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক- নভেলে দেশ ভক্তি ছিল দেবীভূত মাতৃভক্তির নামান্তর। ‘গোরা’র রচনাকাল ও প্রকাশকালও এই বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে অতিভক্তির কাল। কিন্ত গোরার দেশপ্রেম দেশমাতৃকা সম্বন্ধে কোনো ভাবানুভূতি নয়। দেশের মানব গোষ্ঠী সম্বন্ধেই তার আগ্রহ এবং এটাই তার দেশপ্রেম। সে কারণে গোরা কখনো দেশ জননীর কথা বলেনি। সে সুচরিতা অথবা পানু বাবু এদের সকলের কাছে ভারতবর্ষের কথা বলেছে। গোরার যন্ত্রণাটা আসলে ভারত বর্ষ সন্ধানের যন্ত্রনা। বাবু কালচারের অপরিহার্য ফল হিসেবে গোরা এ কথাটা ঠিকই উপলব্ধি করেছিল যে সে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। যেটাকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, বলেছিলেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমবেদনা নাই, সেই খন্ডীভবন যন্ত্রণার পূর্ণ নিদর্শন গোরা।”

ঘরে বাইরে উপন্যাসটি চলিত ভাষায় লেখা। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে বিমলা,নিখিলেশ,সন্দীপের জীবন দেখার ভঙ্গি, মনোবিশ্লেষণ, স্বদেশীয়ানা প্রকাশিত।

সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয়তাবাদের কবলে অতীন্দ্র এলার কাহিনি চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। উগ্র স্বদেশীকতার দিকটি এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তবে উপন্যাসটি যেন উপন্যাস কম, কবিতা বেশি হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ সম্বন্ধে লিখেছেন- " চার অধ্যায় যে দিকটা পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতার অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়াছে যাদু। সেইটের ভেতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায় সেটা ঠিক গল্পের বাহন নয়। অতীন আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা- নভেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে।"

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ দামিনীর বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের আভাস ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

'শেষের কবিতা' সার্থক কাব্যধর্মী উপন্যাসের উদাহরণ। অমিত ও লাবণ্য একে অপরকে ভালবাসলেও লাবণ্যর বিয়ে ঠিক হয় শোভনলালের সঙ্গে এবং অমিত ফিরে যায় কেতকীর কাছে। অমিত মনে করে –

"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব।আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দীঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'গ্রন্থে বলেছেন – " অমিত ও লাবণ্যের প্রনয় কাহিনী অনন্যসাধারণতার দিক দিয়া অতুলনীয়। অমিতের চরিত্রের যে একটা সদা চঞ্চল, প্রথা-বন্ধনমুক্ত,বিচিত্র লীলায়িত প্রান হিল্লোল আছে, তাহাই তাহার সমস্ত চিন্তা ধারা ও কর্ম প্রচেষ্টাকে এমন একটা নৃত্যশীল গতিবেগ দিয়াছে যাহা আমাদের পদাতিক জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অননুমেয়।"

'দুই বোন' উপন্যাসে শশাঙ্কের জীবনে শর্মিলা এবং উর্মিমালার অবস্থান এবং অপরদিকে আদিত্যকে কেন্দ্র করে নীরজা ও সরলার প্রনয় দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি গল্পের আঙ্গিকে লেখা।

রবীন্দ্র সৃষ্ট উপন্যাস গুলি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন দিকদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'গোরা'র সমতুল্য শুধু রোমান্স ও ইতিহাসকে নয় বরং জীবনের নানা দিককে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে অতীতের উপন্যাসকে অনুকরণ না করে স্বতন্ত্র ধারায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

৭.৪ : বাংলা উপন্যাসের ধারায় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে যারা সমগ্র বাঙালী মানসকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র উত্তর পর্বে কথাসাহিত্যে বৈচিত্র্য ও গতিপরিবর্তনে এই তিনজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রয়েছে একটা স্নিগ্ধ শান্ত গার্হস্থ্য রুপ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের জটিলতা তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

শরৎ পরবর্তী কথাসাহিত্যে যার কলমের ছোয়া উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে তিনি হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরেছেন কিন্ত তা নিয়ে বিদ্রোহের সুর তোলেননি। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন তার সুখ দুঃখ এবং জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান প্রকৃতিকে তার লেখায় স্থান দিয়েছেন। তার উপন্যাসগুলি হল- 'পথের পাঁচালী'(১৯২৯), 'অপরাজিত'(১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ'(১৯৩৫), 'আরণ্যক'(১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'(১৯৪০), 'বিপিনের সংসার'(১৯৪১), 'দুই বাড়ি'(১৯৪১), 'অনুবর্তন'(১৯৪২), 'দেবযান'(১৯৪৪), 'কেদাররাজা'(১৯৪৫), 'অথৈ জল'(১৯৪৭) 'ইছামতী'(১৯৫০), 'দম্পতি' (১৯৫২), 'অশনি সংকেত'(১৯৫৯) ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি 'পথের পাঁচালী'র অপুকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। পথেই ডাকেই অপু এগিয়ে চলবে

-এই আশ্বাসেই ‘পথের পাঁচালী’র সমাপ্তি। ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- “ ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধা পথ অবলম্বন করেননি, একটি বালকচিও কীভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল, জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও তার সেই রূপকথার জগৎ হারিয়ে গেল না, তারপর তার পুত্রের মধ্যেও সেই জীবন প্রতীতি বয়ে চলল -সেই কথাটাই বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।”

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন –

“তিনি আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষনপন্থী নন। জীবনের ব্যাখ্যাতার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেননি, তিনি জীবনের উপভোক্তা।... তারাশঙ্করের রুদ্রতা, মানিকের বিজ্ঞান বুদ্ধি, প্রেমেন্দ্রের জীবন তৃষ্ণা তার মধ্যে নেই- কিন্তু এই তিনজনের মতোই জীবন এবং মানুষের প্রতি তার অকৃপণ মমতা আছে।... বিভূতিভূষণের সাহিত্যে একদিকে যেমন সরল পল্লীপ্রাণ মানুষ- সে সামাজিক, হৃদয়বান, পরদুঃখকাতর, সংযতেন্দ্রিয় ; অন্যদিকে একটি ঘর ভোলা মুগ্ধদৃষ্টি কিশোর- যার চোখের সামনে প্রকৃতি প্রতিদিন নব নব রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত করেছে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাধনার মধ্য দিয়ে পরিশেষে সে বিশ্বরূপের সন্ধান পেয়েছে।”

‘দৃষ্টি প্রদীপ’ উপন্যাসে বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার আবহ জুড়ে উপন্যাসের অনেক ঘটনা লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনঅভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসে সত্যচরণ নামে এক শিক্ষিত বাঙালি মাস্টারি ছেড়ে উত্তর বাংলা ও বিহারে সীমানায় ধনী বন্ধুর জঙ্গলমহলে জমি বন্দোবস্ত করার কাজ নেয় এবং জঙ্গলে কাঠ কেটে অরণ্যকে নির্মূল করা হলে নায়ক পরবর্তীতে অরন্যের বিগত সৌন্দর্যের কথা ভাবে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' রাঁধুনী বামুনহাজারি ঠাকুরকে নিয়ে লেখা। 'বেচু চকত্তির' হোটেল থেকে তার কাজ চলে যাওয়ায় তার রান্নার গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ীরা তাকে নতুন হোটেল খোলার জন্য সাহায্য করে যার নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। ইছামতি নদীর তীরবর্তী মানুষজন, তাদের সামাজিক কাহিনী এবং নীলকুঠি ও নীলচাষ সংক্রান্ত নানা ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ইছামতি' উপন্যাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলায় ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ দেখা যায় তাঁর ঐতিহাসিক চিত্র 'অশনিসংকেত'এ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

উপন্যাস সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর উপন্যাসে আছে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি। জীবনের বিশালতা -গভীরতা, মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি ও সমাজ প্রভৃতি ফুটে উঠেছে তার উপন্যাস সাহিত্যে।

রাঢ় বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠী সাঁওতাল,বাজিকর, বৈষ্ণব,এদের জীবন বার বার উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে।'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ড:দেবেশ কুমার আচার্য বলেছেন আজকের দিনেও তার গুরুত্বের কারণ তার সমাজদর্শন বা লেখনরীতির গুরুত্বের মধ্যে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে তাঁর কথাসাহিত্য জগতের বিশালতায়, বিষয় নির্বাচনে, গ্রামীণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ভাঙা-গড়ার চিত্রাঙ্কনের চেষ্টায়। উপন্যাসের পরিধি বাড়িয়ে নীচুতলার মানুষকে স্থান দেওয়া এবং বই পড়া জ্ঞান দিয়ে নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে- এখানেই তারাশঙ্কর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে পেরিয়ে গেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়কার সাহিত্যিক যখন পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এর অবসান হয়ে নতুন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছিল।তার প্রধান প্রধান উপন্যাস গুলি হল – 'চৈতালী ঘূর্ণি'(১৯২৮), 'ধাত্রীদেবতা'(১৯৩৯), 'কালিন্দী'(১৯৪০), 'গণদেবতা'(১৯৪২), 'মন্বন্তর'(১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম'(১৯৪৪), 'কবি'(১৯৪২), 'সন্দীপন

পাঠশালা'(১৯৪৬), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'(১৯৫১), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'(১৯৫১ মতান্তরে ১৯৫৫), 'রাধা'(১৯৫৭), 'মহাশ্বেতা'(১৯৬০) প্রভৃতি।

'গণদেবতা' উপন্যাসের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসার এবং সনাতন নিয়মনীতি লঙ্ঘন এই উপন্যাসের বক্তব্য বিষয়। কালীপুর গ্রামের অনিরুদ্ধ এবং ছুতোর গিরিশ শহরে বাজারে দোকান দেয়, গ্রামের মানুষ অসন্তুষ্ট হয় এবং চণ্ডীমণ্ডপের সভা ডাকে।ছিরু পাল এতে মদত দেয়। ফলে ছিরুর সঙ্গে অনিরুদ্ধর সংঘর্ষ হয়,যার ফলস্বরুপ অনিরুদ্ধর জমির ফসল রাতে কিছু লোক কেটে নিয়ে যায়। অনিরুদ্ধ বুঝতে পারে এর পেছনে কে আছে,কিন্ত কিছু করতে পারে না,কারন ছিরুর প্রভাব প্রতিপত্তি। হতাশায় মদ্যপান করে অনিরুদ্ধ।পাঠশালার পন্ডিত দেবনাথ ঘোষ উপলব্ধি করে প্রাচীন গ্রামীণ ব্যবস্থার ভাঙ্গন।

এই উপন্যাসে গ্রামবাংলার রীতিনীতি, পূজা,পালা ব্রত,পার্বণ প্রভৃতির উল্লেখ, মানুষের জীবনযাত্রার পরিরর্তন, কলকারখানার প্রসার, এইসব দিক দেখানো হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে বাস্তব ভূমিতে দেখেছেন। জীবনের জটিলতা ও গভীরতাকে খুঁজে বার করেছেন, নর-নারীর জৈব সত্তা এবং তার বিকারের নানা রেখাচিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাহিত্যে। বুদ্ধদেব বসুর মতে তিনি ' Belated kollolian' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাকে বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। এই অভিধা সর্বাংশে সত্য নয়, কারণ তিনি কল্লোলীয় আদর্শকে সংযমের সূত্রে গ্রহণ করেছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তার স্বভাব সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন – "মানিক বন্দোপাধ্যায় সংশয়, হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ ও অসহায়তা বোধের কাছে পরাজয় মেনে নেন নি। মানিকের গল্প পাঠককে কুলহারা জীবনরহস্যের দিকে ঠেলে দেয় না,সংগ্রামী সংকল্প কঠিন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেয়। বিজ্ঞান বুদ্ধি, সত্য এষনা, বস্তু জিজ্ঞাসা মানিকের শিল্পী মানসকে গোড়া থেকেই ভাবালুতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।"(কালের পুত্তলিকা)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন – "জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়া তাগিদে আমি লিখি"(কেন লিখি)। ১৯৩৫ সালে তার প্রথম উপন্যাস 'জননী' প্রকাশিত হয়।তার অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল- 'দিবারাত্রির কাব্য'(১৯৩৫), 'পুতুল নাচের ইতিকথা'(১৯৩৬), 'পদ্মা নদীর মাঝি'(১৯৩৬), 'সহরতলী'(১ম পর্ব-১৯৪০,২য় পর্ব ১৯৪১) 'অহিংসা'(১৯৪১), 'হলুদ নদী সবুজ বন'(১৯৫৬)।

'দিবারাত্রির কাব্য'উপন্যাসের তিনটি ভাগ। প্রথমভাগে 'দিনের কবিতা', হেরম্ব সুপ্রিয়ার সম্পর্কের কথা, দ্বিতীয় ভাগে রাতের কবিতা হেরম্বর আনন্দর প্রতি আকর্ষণ, তৃতীয় ভাগ দিবারাত্রির কাব্যে সুপ্রিয়ার আবির্ভাবে হেরম্বর অন্তর্দ্বন্দ্ব।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে পুতুলনাচের ন্যায় মানুষের জীবনের ইতিকথা, গাউদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা, সমস্যা প্রকাশিত। শশী কুসুমের কাহিনির পাশাপাশি,মতি-কুসুম,ও নন্দ-বিন্দুর উপকাহিনী রয়েছে। চরিত্র চিত্রণে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ঔপন্যাসিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

মুখোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন- " উপন্যাসের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয়ে, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির নব নব প্রয়োগে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানায় ও সাহিত্যে তাঁর সত্য রূপায়নের তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও আন্তরিক ব্যাকুলতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস লেখকদের প্রেরণাস্থল হয়ে আছেন।... জীবন শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিন মুখোশ পরেননি, সেই তার অহংকার।"(কালের প্রতিমা)

সত্যি তিনি মুখোশ না পড়ে মেকি সুবিধাবাদি কৃত্রিম জীবন ও মানুষের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তার শিল্পীসত্তা দিয়ে। তাই বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

৭.৪ : প্রশ্নোত্তর

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসের নাম লেখ?

উ: ‘রাজসিংহ', ‘বিষবৃক্ষ’

২. বঙ্কিম পরবর্তী দুজন ঔপন্যাসিকের নাম লেখ?

উ: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি স্বদেশচেতনামূলক উপন্যসের নাম লেখ?

উ: ‘ গোরা', ‘ঘরে বাইরে'।

৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যসের নাম লেখ?

উ: ‘পথের পাঁচালী' ও ‘আরণ্যক’

৫. ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসটি কার লেখা?

উ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

৭.৫ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. রবীন্দ্র উপন্যাসের সাথে রবীন্দ্র পরবর্তী যে কোন একজন ঔপন্যাসিকের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৭.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

১. ‘কালের পুত্তলিকা'- অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য